# জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন
## GENETICS AND EVOLUTION

**ইউনিট ১১**

প্রজনন জীবের একটি বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে মাতা-পিতার বৈশিষ্ট্য পরবর্তী বংশধরে সঞ্চালিত হওয়ার মাধ্যমে জীব তার নিজের অস্তিত্ব ধরে রাখে। একেই বংশগতি (Heredity) বলে। বিজ্ঞানের যে শাখায় জিনের গঠন, কার্যপদ্ধতি ও তার বংশানুক্রমিক সঞ্চালন পদ্ধতি ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয় তাই জিনতত্ত্ব (Genetics)। আর জিন হলো বংশগতির মৌলিক একক যা বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে বংশধারা ধরে রাখে। অপরদিকে প্রকৃতিতে যে মন্থর ও ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অতীতে উদ্ভূত কোনো সরল জীব হতে জটিল ও উন্নত জীবের আবির্ভাব ঘটে তাকে বিবর্তন (Evolution) বলে। এ ইউনিটে জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

| | |
|---|---|
| **ইউনিট সমাপ্তির সময়** | **ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ** |

**এ ইউনিটের পাঠসমূহ**

পাঠ ১১.১ : মেন্ডেলের বংশগতির সূত্রাবলি
পাঠ ১১.২ : মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রমসমূহ (প্রথম সূত্র ১:২:১ ও ২:১)
পাঠ ১১.৩ : মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রমসমূহ (দ্বিতীয় সূত্র ৯:৭ ও ১৩:৩)
পাঠ ১১.৪ : লিঙ্গ নির্ধারণ কৌশল
পাঠ ১১.৫ : মানুষের লিঙ্গ সংযুক্তি বৈশিষ্ট্য
পাঠ ১১.৬ : মানুষের বংশগতিজনিত রোগসমূহ
পাঠ ১১.৭ : সমালোচনাসহ বিবর্তনের মতবাদসমূহ

## পাঠ-১১.১ মেন্ডেলের বংশগতির সূত্রাবলি

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি–**

- মেন্ডেলিজম ও মেন্ডেলিয়ান বংশগতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জিনতত্ত্বে ব্যবহৃত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মেন্ডেলের বংশগতির প্রথম সূত্র উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মেন্ডেলের বংশগতির দ্বিতীয় সূত্র উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **প্রধান শব্দ** | জিনোটাইপ, ফিনোটাইপ, জিন, অ্যালিল |

**মেন্ডেলিজম ও মেন্ডেলিয়ান বংশগতি (Mendelian Inheritance)-** গ্রেগর ইয়োহান মেন্ডেলই সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি বংশগতির নীতিসমূহ উদ্ভাবনে সমর্থ হন। মেন্ডেল ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে ২ রা জুলাই তৎকালীন অস্ট্রোহাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সাইলেসিয়া (Silesia) অঞ্চলের হাইসেনডর্ফ (Heinzendorf- বর্তমানে চেক প্রজাতন্ত্রের অংশ) গ্রামের এক গরীব কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জার্মান ও চেক শ্রি বংশোদ্ভুত পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর মেন্ডেল প্রধানত আর্থিক কারণে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে অস্ট্রিয়ার মোরাভিয়া অঞ্চলে ব্রন (Brun- বর্তমানে ব্রুনো=brno; চেক প্রজাতন্ত্র) নামক স্থানের অগাস্টিনিয়ান মঠে শিক্ষানবীশ হিসেব যোগদান করেন। চার বৎসর পর তিনি যাজক হন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে স্নেম (Znaim) প্রিপারেটরী স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। অতঃপর ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ১৮৫৩ পর্যন্ত পড়াশুনা করে ব্রুনে ফিরে আসেন। ব্রুনে মডার্ন স্কুলে ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানের সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং ১২ বৎসর একজন সার্থক শিক্ষক হিসেবে সুনামের সাথে কর্মরত ছিলেন। দীর্ঘ সাত বৎসর গবেষণা করেন।

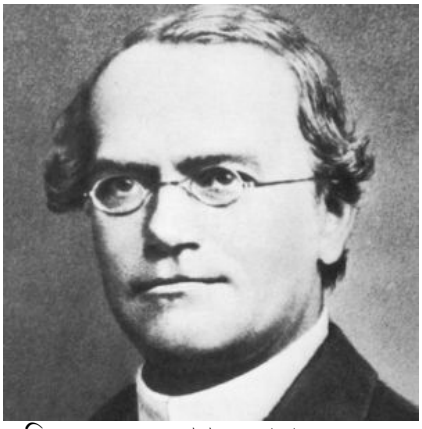

চিত্র ১১.১.১ঃ গ্রেগর জোহান মেন্ডেল

স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় মঠের বাগানে অবসর সময়ে মটরশুঁটি (*Pisum sativum*) উদ্ভিদ নিয়ে ১৮৫৭ থেকে গবেষণা শুরু করেন। সঙ্করায়ণ (Hybridization) পরীক্ষার জন্য মটরশুঁটি উদ্ভিদকে নির্বাচন করেন। মটরশুঁটি উদ্ভিদ উভলিঙ্গী, স্বপরাগায়নের মাধ্যমে যৌন প্রজনন সম্পন্ন হয়। পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবককে ঘিরে দলমণ্ডল (corolla) এমনভাবে সজ্জিত যে, পরনিষেকের (Cross fertilization) কোন সম্ভাবনা নেই। ফলে বিভিন্ন জাতের (variety) মটরশুঁটি উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলো খাঁটি বা বিশুদ্ধ অবস্থায় আছে। অত্যন্ত অল্প সময়ে এর জীবনচক্র সম্পন্ন হয় এবং স্বল্প শ্রম ও ব্যয়ে অধিক সংখ্যক অপত্য বংশ উৎপন্ন হয়। অপত্য বংশে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের স্পষ্ট প্রকাশ পরীক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। মেন্ডেল বিভিন্ন উৎস হতে ৩৪ ধরনের মটরশুঁটি উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ করে আশ্রমের বাগানে প্রায় এক বৎসর প্রত্যেক ধরনের বীজের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর পরীক্ষায় ব্যবহৃত সাতটি চরিত্রের (trait) জন্য (কাণ্ডের দৈর্ঘ্য, ফুলের অবস্থান, ফুলের

রং, ফলের বর্ণ, ফলের আকৃতি, বীজের বর্ণ এবং বীজের আকৃতি) একজোড়া করে বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ১৪টি খাঁটি উদ্ভিদ নির্বাচন করেন। প্রতি জোড়া বৈশিষ্ট্য পরস্পর বিপরীত ধর্মী। মটরশুঁটি উদ্ভিদের নির্বাচিত বৈশিষ্ট্যের প্রতিটি একটি মাত্র জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। বৈশিষ্ট্য নির্বাচনের বিষয়ে মেন্ডেল অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিলেন। কারণ জটিল বৈশিষ্ট্য নির্বাচন করলে মেন্ডেল বংশগতির অন্তর্নিহিত নীতিগুলো হয়তোবা আবিষ্কার করতে পারতেন না।

মেন্ডেল একটি যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সঙ্করায়ন পরীক্ষা পরিচালনা করেন। অত্যন্ত সাবধানতার সাথে পরীক্ষণসমূহ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনি যে পরাগরেণু স্থানান্তর করেছেন তার দ্বারাই পরাগায়ন হয়েছে তা নিশ্চিত করেন। সঙ্করায়নকালে মেন্ডেল অপত্য অংশে একসাথে মাত্র একটি চরিত্র পর্যবেক্ষণ করেন এবং সম্পূর্ণ উপাত্ত (data) সংরক্ষণ করেন। অতঃপর পরিসংখ্যান (Statistics) এর প্রয়োগ দ্বারা এ উপাত্ত থেকেই লব্ধ ফলাফলের যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণপূর্বক এবং একটানা প্রায় এক দশকের নিরলস পরিশ্রম দ্বারা বংশগতির নিয়ম সম্পর্কে পার্টিকুলেট থিওরী (Particulate theory) উপস্থাপন করেন।

১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী ও মার্চে সঙ্করায়ন ও বংশগতি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার বিবরণ ও ফলাফল ব্রুন ন্যাচারাল হিস্টরী সোসাইটির পরপর দুটি বৈজ্ঞানিক সভায় উপস্থাপন করেন। সোসাইটির বার্ষিক মুখপত্রেও গবেষণা পত্রটি প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় তৎকালীন বিশ্বে কেউই ধর্মযাজক মেন্ডেল এর গবেষণা ফলাফলের গুরুত্ব উপলব্ধি করেননি। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে মেন্ডেল মঠাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে ৬ই জানুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবদ্দশায় তাঁর গবেষণা কর্মের জন্য তিনি কোন স্বীকৃতি লাভ করেননি।

মেন্ডেলের গবেষণাপত্র প্রকাশের ৩৫ বৎসর পর বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই হল্যান্ডের দ্য ভ্রিস (de Vries) , জার্মানির কার্ল করেন্স (Karl Correns) ও অস্ট্রিয়ার শেরমাক (Tscher Mak) পৃথক পৃথকভাবে গবেষণা করে মেন্ডেল এর ফলাফলকে সমর্থন করেন। বর্তমানে বিশ্বে মেন্ডেল এর আবিষ্কার অর্থাৎ পার্টিকুলেট থিওরী (particulate theory) একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পার্টিকুলেট থিওরী (particulate theory) তে বর্ণিত সুত্রগুলো জেনেটিক্সে মেন্ডেল এর সূত্র (Mendel's Law) নামে অভিহিত। মেন্ডেল এর সূত্র অনুযায়ী জীবের বৈশিষ্ট্যসমূহ বংশগতিতে সঞ্চারণের যে ব্যাখ্যা দেয়া হয় তাকেই মেন্ডেলতত্ত্ব (Mendelism) বলে। মেন্ডেলতত্ত্ব আধুনিক জেনেটিক্স এর প্রধান ভিত্তি। একারণেই মেন্ডেলকে জেনেটিক্স এর জনক বলা হয়ে থাকে।

পার্টিকুলেট থিওরী ((particulate theory) বা মেন্ডেলতত্ত্ব (Mendelism) অনুযায়ী জীবে বংশগতির একক বিদ্যমান থাকে বা মিশ্রিত হয়না, শুধুমাত্র সুপ্ত থাকে। মেন্ডেলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মটরশুঁটি উদ্ভিদে প্রতিটি চরিত্রের (trait) জন্য **(কাণ্ডের দৈর্ঘ্য, ফুলের অবস্থান, রং, ফলের বর্ণ, ফলের আকৃতি, বীজের বর্ণ এবং বীজের আকৃতি)** এক জোড়া ফ্যাক্টর থাকে, যার একটি আসে পিতা থেকে এবং অপর একটি আসে মাতা থেকে। গ্যামিটে শুধু একটি একক উপস্থিত থাকে এবং পরবর্তী জনুতে সঞ্চারিত হয়। মেন্ডেল বর্ণিত পার্টিকল বা ফ্যাক্টর অবশ্যই জিন। আর একটি মাত্র জিন দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য মেন্ডেলিয়ান বৈশিষ্ট্য (Mendelian trait) বলে এবং মেন্ডেলিয়ান বৈশিষ্ট্যর সঞ্চায়ণকে মেন্ডেলিয়ান বংশগতি (Mendelian inheritance) বলা হয়।

**জেনেটিক্সে ব্যবহৃত কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা**

**জিন (Gene)-** W.L Johannsen (গ্রিক genes=born) ১৯০৯ খিস্টাব্দে জিন শব্দটি ব্যবহার করেন। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে মেন্ডেল এর অনুমানকৃত জীবের বৈশিষ্ট্য নির্ধারক বস্তুটি হলো এলিমেন্টিস বা ফ্যাক্টর (elementes or factor) যা পরবর্তীকালে জিন নামে অভিহিত হয়। জিন হচ্ছে বংশগতির মৌলিক একক (basic unit of heredity) এবং এরা বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে বংশগতিধারা অব্যাহত রাখে। জিনকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে- জিন হচ্ছে পলিপেপটাইড সংশ্লেষের জন্য সংকেত প্রদানকারী DNA অণুর অংশ বিশেষ (gene is a part of a DNA molecule code for polypeptide synthesis)।

**লোকাস (Locus.Pl-Loci)**- ক্রোমোসোমে একটি জিনের অবস্থানকে লোকাস বলে।

**অ্যালিল (Allel), অ্যালিলোমর্ফ (Allelomorph) :** ক্রোমোসোমের একই লোকাসে অবস্থানকারী জিনগুলোকে পরস্পরের অ্যালিল বলা হয়। জিনগুলোর একত্রে অবস্থান করাকে অ্যালিলোমর্ফ বলে। মনে করি, মানুষে বাদামী চোখের রং এর জন্য দায়ী জিন B ও নীল চোখের রং এর জন্য দায়ী জিন b পরস্পরের অ্যালিল।

**জিনোটাইপ** (Genotype): জীবদেহের দৃশ্যমান অথবা সুপ্ত বেশিষ্ট্যগুলোর নিয়ন্ত্রক জিনসমূহের গঠনকে জিনোটাইপ বলে। মনেকরি, মটরশুঁটি গাছের লম্বা কাণ্ডের জন্য T জিন এবং বামন কাণ্ডের জন্য T জিন দায়ী। অতএব TT, tt, Tt যথাক্রমে বিশুদ্ধ লম্বা, বিশুদ্ধ বামন ও সঙ্কর (hrbrid) লম্বা মটরশুঁটি গাছের জিনোটাইপ।

**ফিনোটাইপ (Phenotype)-** জীবদেহের দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যসমূহকে ফিনোটাইপ বলে। ফিনোটাইপ প্রকৃতপক্ষে জিনোটাইপের জিনসমূহের বাহ্যিক প্রকাশ। যেমন- লম্বা ও বামন মটরশুঁটি গাছে উচ্চতা সম্পর্কিত বাহ্যিক প্রকাশগুলো যথাক্রমে TT বা Tt ও tt জিনোটাইপগুলোর ফিনোটাইপ।

**হোমোজাইগাস (Homozygous) ও হেটারোজাইগাস (Heterozygous)**- জীবে একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন জোড়া একই রকমের (উভয় জিনই প্রকট বা প্রচ্ছন্ন) হলে তাকে হোমোজাইগাস জীব বলে। জিন জোড়া ভিন্ন রকমের হলে সে জীবকে হেটারোজাইগাস জীব বলে। যেমন- বিশুদ্ধ লম্বা মটরশুঁটি গাছে একটি প্রকার দুটি প্রকট জিন (TT) থাকে। অতএব, এটি হোমোজাইগাস লম্বা। কিন্তু সঙ্কর লম্বা গাছে একটি প্রকট জিন ও একটি প্রচ্ছন্ন জিন থাকে। অতএব, তাকে হেটারোজাইগাস লম্বা (Tt) বলে।

**প্রকট (Dominant) ও প্রচ্ছন্ন (Recessive)-** এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবে সঙ্করায়ন ঘটালে ১ম অপত্য বংশে সঙ্কর জীবে ঐ বৈশিষ্ট্য দুটির যেটি প্রকাশিত হয় তাকে প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং যে বৈশিষ্ট্য সুপ্ত থাকে তাকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন- বিশুদ্ধ লম্বা মটরশুঁটি গাছ ও বামন মটরশুঁটি গাছের প্রজননে ১ম অপত্য বংশে সকল গাছই লম্বা হয়। এক্ষেত্রে লম্বা বৈশিষ্ট্যকে প্রকট ও বামন বৈশিষ্ট্যকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে। প্রকট-প্রচ্ছন্ন জিনগুলো হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের একই লোকাসে অবস্থান করে।

**এক সঙ্কর (Monohybrid) ও দ্বিসঙ্কর (Dihybrid) ক্রস-** যখন কোন ক্রসে মাত্র একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জিন বিবেচনা করা হয় তাকে এক সঙ্কর ক্রস বলে। যেমন- বিশুদ্ধ লম্বা মটরশুঁটি ও বামন মটরশুঁটি গাছের মধ্যে সংকরায়ন। অপরদিকে, যখন কোনো ক্রসে দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জিন থাকে তখন তাকে দ্বিসঙ্কর ক্রস বলা হয়। উদাহরণ- মটরশুঁটিতে গোল-হলুদ বীজ সম্পন্ন গাছ ও কুঞ্চিত-সবুজ বীজ সম্পন্ন গাছের মধ্যে সংকরায়ন।

## মেন্ডেলের বংশগতির প্রথম সূত্র

'জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি একক দায়ী থাকে যাকে ফ্যাক্টর (জিন) বলা হয় এবং ফ্যাক্টর বা জিনগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে। সঙ্কর (hybrid) জীবে ফ্যাক্টর বা জিনগুলো মিশ্রিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং গ্যামিট উৎপাদনের সময় অপরিবর্তিত অবস্থায় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামিটে গমন করে'। একে পৃথকীকরণ সূত্র বা মনোহাইব্রিড ক্রসের সূত্রও বলে।

উদাহরণঃ একটি বিশুদ্ধ কালো গিনিপিগের সাথে একটি বিশুদ্ধ সাদা গিনিপিগের ক্রস করলে সন্তান-সন্ততি কালো হয়। এ ক্রসে ব্যবহৃত পিতা-মাতাকে প্যারেন্টাল জেনারেসন (Parental generation, $P_1$) এবং উৎপন্ন সন্তান-সন্ততিকে ১ম অপত্য বংশ (First filial generation) বা $F_1$ বলে। আবার $F_1$ সন্তান-সন্ততির মধ্যে ক্রস করলে ৩/৪ ভাগ কালো গিনিপিগ এবং ১/৪ ভাগ সাদা গিনিপিগের জন্ম হয়। উৎপন্ন সন্তান-সন্ততিকে ২য় অপত্য বংশ (Second filial generation) বা $F_2$ বলে।

$F_1$ বংশে সাদা গিনিপিগের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এবং $F_2$ বংশে সাদা গিনিপিগের নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে পুনরায় উপস্থিতি যথার্থই প্রমাণ করে যে, গিনিপিগে কালো ও সাদা বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য নিশ্চয়ই পৃথক পৃথক কোন ফ্যাক্টর বা জিন আছে এবং $F_1$ বংশে সাদা বৈশিষ্ট্য নির্ধারক ফ্যাক্টর বিনষ্ট হয় নাই বরং বৈশিষ্ট্য নির্ধারক ফ্যাক্টরের পাশাপাশি সুপ্তভাবে উপস্থিতি আছে। তা না হলে $F_1$ বংশের কালো গিনিপিগ থেকে $F_1$ বংশে কালো গিনিপিগই জন্ম লাভ করতো। এ ধরনের মনোহাইব্রিড ক্রসে $F_1$ বংশে প্রকাশিত বৈশিষ্ট্য প্রকট (dominant) এবং অপ্রকাশিত বা সুপ্ত বৈশিষ্ট্যকে প্রচ্ছন্ন (recessive) বৈশিষ্ট্য বলে।

পিতামাতা ($P_1$)
ফিনোটাইপঃ বিশুদ্ধ কালো গিনিপিগ × বিশুদ্ধ সাদা গিনিপিগ
জিনোটাইপ (2n)ঃ BB bb
গ্যামিট (n)ঃ B B b b

**$F_1$ বংশ**
$F_1$ জিনোটাইপ (2n)ঃ Bb Bb Bb Bb
$F_1$ ফিনোটাইপঃ সকল গিনিপিগই বিশুদ্ধ কালো

$F_1$ বংশের গিনিপিগে ক্রস
ফিনোটাইপঃ বিশুদ্ধ কালো গিনিপিগ × বিশুদ্ধ কালো গিনিপিগ
জিনোটাইপ (2n)ঃ Bb Bb
গ্যামিট (n)ঃ B b B b

**$F_2$ বংশ**
জিনোটাইপঃ BB Bb Bb bb
জিনোটাইপিক অনুপাতঃ ১ঃ১ঃ১ঃ১
ফিনোটাইপঃ বিশুদ্ধ কালো ঃ বিশুদ্ধ কালো ঃ বিশুদ্ধ কালো ঃ বিশুদ্ধ সাদা
$F_2$ ফিনোটাইপ অনুপাতঃ ৩ঃ১

মনোহাইব্রিড ক্রসটির পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, $F_1$ বংশের প্রত্যেক গিনিপিগে কালো ও সাদা উভয় বৈশিষ্ট্য নির্ধারক ফ্যাক্টর বর্তমান এবং পিতা-মাতার গ্যামিটের মাধ্যমে নিষেকের ফলে একত্রিত হয়েছে। পরবর্তীতে $F_2$ বংশের গিনিপিগে জন্মলাভের সময় $F_1$ বংশে উপস্থিত কালো ও সাদা নির্ধারক ফ্যাক্টরদ্বয় গ্যামিট তৈরির মাধ্যমে পুনরায় পরস্পর থেকে পৃথক হয়েছে এবং ৩ ঃ ১ ফিনোটাইপিক ও অনুপাত যথাক্রমে কালো ও সাদা গিনিপিগ উৎপন্ন করেছে।

**মনোহাইব্রিড ক্রসের জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা**- গিনিপিগের গাত্রবর্ণ নির্ধারণের জন্য দুটি অ্যালিল থাকে। মনে করি, গিনিপিগের কালো রঙের জন্য B জিন দায়ী। অতএব, একটি বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস কালো গিনিপিগের জিনোটাইপ BB (কারণ, দেহকোষে কমপক্ষে দুটি ক্রোমোসোম থাকে)। অনুরূপভাবে গিনিপিগের সাদা রঙের জন্য b জিন দায়ী। অতএব, বিশুদ্ধ সাদা গিনিপিগের জিনোটাইপ bb।

হোমোজাইগাস কালো (BB) এবং বিশুদ্ধ হোমোজাইগাস সাদা (bb) পিতা-মাতা ($P_1$) প্রজননের পূর্বে গ্যামিট তৈরি করবে। ফলে কালো গিনিপিগের স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের গ্যামিটে B জিন এবং সাদা গিনিপিগের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষ সকল গ্যামিটে b জিন থাকবে। এখন উপরিউক্ত কালো ও সাদা গিনিপিগের ক্রসে B এবং b জিন সম্পন্ন পুং ও স্ত্রী গ্যামিটের মিলনে জিনোটাইপ সম্পন্ন $F_1$ বংশের জন্ম হবে] $F_1$ বংশ ধরদের মধ্যে B এবং b উভয় অ্যালিল উপস্থিত থাকার কারণে এদের ফিনোটাইপ হবে হেটারোজাইগাস কালো। এখানে কালো রঙের জিন B প্রকট এবং সাদা রঙের জিন b প্রচ্ছন্ন। এ জিনদ্বয় হোমোলোগাস ক্রোমোসামের একই লোকাসে অবস্থান করবে।

$F_1$ বংশের হেটারোজাইগাস কালো গিনিপিগ (Bb) পুনরায় প্রজননের জন্য গ্যামিট সৃষ্টি করবে এবং পুরুষ-স্ত্রী প্রত্যেক দুই প্রকার গ্যামিট তৈরি করবে। গ্যামিটের অর্ধেকে থাকবে B জিন এবং বাকি অর্ধেকে থাকবে b জিন। কারণ সঙ্কর (hybrid) গিনিপিগের B ও b জিন ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোসোমে অবস্থান করে এবং একই কোষে অবস্থান কালে মিশ্রিত হয় না বা বিনষ্ট হয় না। এখন B জিন বহনকারী পুং গ্যামিট B বা b জিন বহনকারী স্ত্রী গ্যামিটকে নিষিক্ত করতে পারে। অনুরূপভাবে b জিন বহনকারী পুং গ্যামিট B বা b জিন বহনকারী স্ত্রী গ্যামিটকে নিষিক্ত করতে পারে। ফলে $F_2$ বংশ 1 BB : 2 Bb : 1bb জিনোটাইপিক অনুপাতে যথাক্রমে হোমোজাইগাস কালো, হেটারোজাইগাস কালো এবং হোমোজাইগাস সাদা গিনিপিগ জন্ম লাভ করে। এদের ফিনোটাইপিক অনুপাত হয় ৩ কালো ঃ ১ সাদা।

## মেন্ডেল এর বংশগতির দ্বিতীয়সূত্র

'দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবে সঙ্করায়ন ঘটালে গ্যামিট সৃষ্টিকালে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের ফ্যাক্টর বা জিন যুগলের স্বাধীন সঞ্চারণ বা বিন্যাস ঘটে এবং কোন একটি ফ্যাক্টর যুগলের সঞ্চারণ অন্য ফ্যাক্টর যুগলের উপর নির্ভরশীল নয়'। একে স্বাধীন সঞ্চারণ বা ডাইহাইব্রিড ক্রস সূত্রও বলে।

ব্যাখ্যা- মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র ব্যাখ্যার জন্য একটি ডাইহাইব্রিড ক্রস বর্ণনা করা হলো। দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের মধ্যে প্রজননকে ডাইহাইব্রিড ক্রস বলা হয়। গিনিপিগের কালো গাত্রবর্ণ সাদা গাত্রবর্ণের উপর প্রকট এবং অমসৃণ লোমের অবস্থা মসৃণের উপর প্রকট। বিশুদ্ধ কালো-অমসৃণ (black-rough) গিনিপিগের সাথে বিশুদ্ধ সাদা-মসৃণ (white-smooth) গিনিপিগের ক্রস করলে $F_1$ বংশের কালো-অমসৃণ পুরুষ ও স্ত্রী গিনিপিগের মধ্যে ক্রস করলে $F_2$ বংশে নিম্নলিখিত অনুপাতে গিনিপিগ জন্মলাভ করে।

কালো-অমসৃণঃ কালো-মসৃণ ঃ সাদা-অমসৃণ ঃ সাদা-মসৃণ = ৯ঃ৩ঃ৩ঃ১

**পর্যবেক্ষণঃ উপরিউক্ত ডাইহাইব্রিড ক্রসে দুটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ**

**ক)** পিতামাতার অনুরূপ (কালো-অমসৃণ এবং সাদা-মসৃণ) গিনিপিগ ছাড়াও দুই ধরনের (কালো-মসৃণ এবং সাদা-অমসৃণ) নতুন গিনিপিগ জন্মলাভ করেছে।

খ) শুধু একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের (কালো-অমসৃণ এবং সাদা-মসৃণ) বংশগতিতে $F_1$ বংশে মনোহাইব্রিড ক্রসের মতই ৩ঃ১ অনুপাত বজায় থাকে। প্রতি ১৬টি গিনিপিগের মধ্যে ১২টি কালো এবং ৪টি সাদা অর্থাৎ কালো ও সাদা গিনিপিগের অনুপাত ৩ঃ১। আবার প্রতি ১৬টি গিনিপিগের মধ্যে ১২টি অমসৃণ এবং ৪টি মসৃণ অর্থাৎ অমসৃণ ও মসৃণ গিনিপিগের অনুপাত ৩ঃ১।

**বিশ্লেষণঃ** উপরের তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে এই তথ্যে উপনীত হওয়া যায় যে, কালো গাত্রবর্ণ ও সাদা গাত্রবর্ণ বৈশিষ্ট্য দুটির সঞ্চারণ অমসৃণ ও মসৃণ বৈশিষ্ট্য দুটির সঞ্চারণ অমসৃণ ও মসৃণ বৈশিষ্ট্য দুটির সঞ্চারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত বা নির্ভরশীল নয়। যদি নির্ভরশীল হতো তাহলে কালো দেহ ও সাদা দেহ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কিংবা অমসৃণ দেহ ও মসৃণ দেহ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ৩ঃ১ অনুপাত বজায় থাকতো না।

**ডাইহাইব্রিড ক্রসের জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা-** গিনিপিগের কালো গাত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য জিন প্রতীক B এবং অমসৃণ বৈশিষ্ট্যের জন্য জিন প্রতীক R কল্পনা করলে একটি বিশুদ্ধ কালো-অমসৃণ গিনিপিগের জিনোটাইপ হবে BBRR। কারণ প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একজোড়া জিন বর্তমান। অনুরূপভাবে সাদা গাত্রবর্ণ বৈশিষ্ট্যের জন্য জিন একক b এবং মসৃণ লোম বৈশিষ্ট্যের জন্য জিন একক r কল্পনা করলে একটি বিশুদ্ধ সাদা-মসৃণ গিনিপিগের জিনোটাইপ হবে bbrr।

BBRR এবং bbrr পিতা-মাতা গিনিপিগদ্বয় প্রজননের পূর্বে গ্যামিট উৎপাদন করবে এবং প্রত্যেক গ্যামিটে যথাক্রমে BR এবং br জিন থাকবে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলনে $F_1$ বংশে উৎপন্ন সকল গিনিপিগের জিনোটাইপ হবে BbRr কিন্তু ফিনোটাইপ হবে কালো-অমসৃণ। এখানে B এবং R জিনের উপস্থিতিতে যথাক্রমে b এবং r জিন প্রচ্ছন্ন থাকে।

$F_1$ বংশের হেটারোজাইগাস কালো-অমসৃণ (BbRr) গিনিপিগ পুনরায় প্রজননের পূর্বে মায়োসিসের মাধ্যমে গ্যামিট সৃষ্টি করবে এবং স্ত্রী-পুরুষ প্রত্যেক প্রায় সমান সংখ্যায় চার প্রকার, যথা- BR, Br, bR, br গ্যামিট উৎপন্ন করবে।

এখানে, $F_1$ বংশের দুটি গিনিপিগের মধ্যে ক্রস করলে এদের যেকোনো এক প্রকার পুংগ্যামিট চার প্রকারের স্ত্রী গ্যামিটের যেকোনো এক প্রকারের সাথে মিলিত হতে পারে। ফলে $F_1$ বংশে ১৬ প্রকারের নিষেকের সম্ভাবনা থাকে। সম্ভাব্য নিষেক পানেট চেকার বোর্ডে (উদ্ভাবক Reginald C. Punnet এর নাম অনুসারে) সন্নিবেশ করে প্রাপ্ত জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপ অনুপাত উল্লেখ করা হলো-

পিতামাতা ($P_1$)
ফিনোটাইপঃ বিশুদ্ধ কালো-অমসৃণ গিনিপিগ × বিশুদ্ধ সাদা-মসৃণ গিনিপিগ
জিনোটাইপ (2n)ঃ BBRR bbrr
গ্যামিট (n)ঃ BR BR br br

**$F_1$ বংশ**
জিনোটাইপ (2n)ঃ BbRr BbRr BbRr BbRr
ফিনোটাইপঃ সকল গিনিপিগই বিশুদ্ধ কালো-অমসৃণ

$F_1$ বংশের গিনিপিগে ক্রস
ফিনোটাইপঃ বিশুদ্ধ কালো-অমসৃণ গিনিপিগ × বিশুদ্ধ কালো-অমসৃণ গিনিপিগ
জিনোটাইপ (2n)ঃ BbRr BbRr
গ্যামিট (n)ঃ BR Br bR br BR Br bR br

**$F_2$ বংশ**

| পিতা / মাতা | BR | Br | bR | Br |
|---|---|---|---|---|
| BR | BBRR কালো-অমসৃণ | BBRr কালো-অমসৃণ | BbRR কালো-অমসৃণ | BbRr কালো-অমসৃণ |
| Br | BBRr কালো-অমসৃণ | BBrr কালো-মসৃণ | BbRr কালো-অমসৃণ | Bbrr কালো-মসৃণ |
| bR | BbRR কালো-অমসৃণ | BbRr কালো-অমসৃণ | bbRR সাদা-অমসৃণ | bbRr সাদা-অমসৃণ |
| br | BbRr কালো-অমসৃণ | Bbrr কালো-মসৃণ | bbRr সাদা-অমসৃণ | bbrr সাদা-মসৃণ |

জিনোটাইপঃ **BBRR ঃ BBRr ঃ BbRR ঃ BbRr ঃ BBrr ঃ Bbrr ঃ bbRR ঃ bbRr ঃ bbrr**
জিনোটাইপিক অনুপাত- **১ঃ২ঃ২ঃ৪ঃ১ঃ২ঃ১ঃ২ঃ১**
$F_2$ ফিনোটাইপঃ বিশুদ্ধ কালো-অমসৃণ গিনিপিগঃবিশুদ্ধ কালো-মসৃণঃবিশুদ্ধ সাদা-অমসৃণঃবিশুদ্ধ সাদা-মসৃণ
$F_2$ ফিনোটাইপ অনুপাত ঃ **৯:৩:৩:১**

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | মেন্ডেলের বংশগতির প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের মধ্যকার পাঁচটি পার্থক্য একটি ছকে লিখে ক্লাসে উপস্থাপন করুন |
|---|---|
| | |

**সারসংক্ষেপ**

জিন হচ্ছে পলিপেপটাইড সংশ্লেষের জন্য সংকেত প্রদানকারী DNA অণুর অংশ বিশেষ। ক্রোমোসোমে একটি জিনের অবস্থানকে লোকাস বলে। ক্রোমোসোমের একই লোকাসে অবস্থানকারী জিনগুলোকে পরস্পরের অ্যালিল বলা হয়। জিনগুলোর একত্রে অবস্থান করাকে অ্যালিলোমর্ফ বলে। জীবদেহের দৃশ্যমান অথবা সুপ্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর নিয়ন্ত্রক জিনসমূহের গঠনকে জেনোটাইপ বলে। জীবদেহের দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যসমূহকে ফিনোটাইপ বলে। ফিনোটাইপ প্রকৃতপক্ষে জিনোটাইপের জিনসমূহের বাহ্যিক প্রকাশ। জীবে একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী জিন জোড়া একই রকমের (উভয় জিনই প্রকট বা প্রচ্ছন্ন) হলে তাকে হোমোজাইগাস জীব বলে। জিন জোড়া ভিন্ন রকমের হলে সে জীবকে হেটারোজাইগাস জীব বলে। এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীবে সঙ্করায়ন ঘটালে **১ম** অপত্য বংশে সঙ্কর জীবে ঐ বৈশিষ্ট্য দুটির

যেটি প্রকাশিত হয় তাকে প্রকট বৈশিষ্ট্য এবং যে বৈশিষ্ট্য সুপ্ত থাকে তাকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে। যখন কোন ক্রমে মাত্র একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জিন বিবেচনা করা হয় তাকে এক সঙ্কর ক্রস বলে।
যখন কোনো ক্রসে দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জিন থাকে তখন তাকে দ্বিসঙ্কর ক্রস বলা হয়। মেন্ডেলের বংশগতির প্রথম সূত্রের ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ঃ১ এবং দ্বিতীয় সূত্রের ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ঃ৩ঃ৩ঃ১।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.১

**বহু নির্বাচনি প্রশ্ন**

১। নিচের কোনটি মেন্ডেলের ২য় সূত্রের অনুপাত

ক. ৯ঃ৩ঃ৩ঃ১ খ. ৯ঃ৭
গ. ১৩ঃ৩ ঘ. ৩ঃ১

২। জিন-

i. বংশগতির ধারক ও বাহক
ii. ডিএনএ এর অংশ
iii. প্রোটিন এর একক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. I, ii ও iii

৩। করিম দুটি কুমড়া গাছের ক্রস করালেন। এতে কুমড়া গাছের একটির দুটি জিন ভিন্ন রকমের। গাছটি কি ধরনের?

ক. হোমোজাইগাস খ. হেটারোজাইগাস
গ. হোমোলোগাস ঘ. নন-হোমোলোগাস

## পাঠ-১১.২ মেন্ডেলের প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রমসমূহ (প্রথম সূত্র ১:২:১ ও ২:১)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি–**

- অসম্পূর্ণ প্রকটতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- সমপ্রকটতার ফলাফল উল্লেখ করতে পারবেন।
- লিথাল জিনের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **প্রধান শব্দ** | **অসম্পূর্ণ প্রকটতা, সমপ্রকটতা, লিথাল জিন** |

**অসম্পূর্ণ প্রকটতা (Incomplete Dominance): ফিনোটাইপিক অনুপাত ১ঃ২ঃ১-** একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুইটি জীবের মধ্যে ক্রস করলে প্যারেন্টের বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের কোনোটিই প্রকট বা প্রচ্ছন্ন না হলে ১ম অপত্য বংশে এদের কোনটিই প্রকাশ না পেয়ে উভয় বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে। তবে ১ম ও ২য় অপত্য বংশে জিনোটাইপের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। এরূপ প্যারেন্টের বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের কোনোটা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন না হলে একে অসম্পুর্ণ প্রকটতা বলা হয় এবং অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিনগুলোকে ইন্টারমিডিয়েট জিন বলে। এই ক্ষেত্রে, এর ফলে শুধুমাত্র ফিনোটাইপেরই পরিবর্তন ঘটবে। অসম্পূর্ণ প্রকটতাকে ইন্টারমিডিয়েট ইনহেরিট্যান্সও বলা হয়।

**উদাহরণঃ** অসম্পূর্ণ প্রকটতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো গৃহপালিত আন্দালুসিয়ান জাতের মোরগ-মুরগী। কালো এবং ছোপযুক্ত সাদা পাখির মধ্যে ক্রস করলে $F_1$ অপত্য বংশের পাখি কালো বা ছোপযুক্ত সাদার কোনটাই না হয়ে সকল পাখি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আন্দালুসিয়ান নীল (blue) রঙের হয়। $F_1$ বংশের এই আন্দালুসিয়ান নীল পাখিদের মধ্যে ক্রসে $F_2$ বংশে কালো, আন্দালুসিয়ান নীল এবং ছোপযুক্ত সাদা পাখি যথাক্রমে ১ ঃ ২ ঃ ১ অনুপাতে পাওয়া যায়।

পিতা-মাতা

ফিনোটাইপঃ কালো আন্দালুসিয়ান মোরগ × ছোপযুক্ত সাদা আন্দালুসিয়ান মুরগী

জিনোটাইপঃ RR rr

গ্যামিটঃ R R r r

$F_1$ জনুঃ Rr Rr Rr Rr

$F_1$ জনুর ফিনোটাইপঃ সবই নীল আন্দালুসিয়ান মোরগ-মুরগী

$F_1$ জনুর মধ্যে ক্রস

ফিনোটাইপঃ নীল আন্দালুসিয়ান মোরগ × নীল আন্দালুসিয়ান মুরগী

জিনোটাইপঃ Rr Rr

গ্যামিটঃ R r R r

$F_2$ জনুঃ

| স্ত্রীগ্যামিট ↓ / পুংগ্যামিট → | R | r |
|---|---|---|
| R | RR<br>কালো | Rr<br>আন্দালুসিয়ান নীল |
| r | Rr<br>আন্দালুসিয়ান নীল | rr<br>ছোপযুক্ত সাদা |

$F_2$ জনুর ফিনোটাইপঃ কালো ঃ আন্দালুসিয়ান নীল ঃ ছোপযুক্ত সাদা =১ঃ২ঃ১

**সমপ্রকটতা (Codominance)-** অনেক ক্ষেত্রে হেটারোজাইগাস অবস্থায় কোন অ্যালিল প্রকট না হওয়ার কারণে দুই বা অধিক অ্যালিল সম্পূর্ণ প্রকটতা বা প্রচ্ছন্নতা প্রদর্শন করে না। এ অবস্থায় উভয় অ্যালিল নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য হেটারোজাইগোটের ফিনোটাইপ সমভাবে প্রকাশিত হয়। এরূপ জিনকে কোডমিন্যান্ট জিন (Codominat gene) এবং প্রপঞ্চকে সমপ্রকটতা (Codominance) বলা হয়। উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ে কোডমিন্যান্স পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হেটারোজাইগোটের ফিনোটাইপ হোমোজাইগাস প্রকট এবং হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্নের ইন্টারমিডিয়েট বা মাঝামাঝি হয়।

**উদাহরণঃ খাটো শিংওয়ালা জাতের গরুর গাত্রবর্ণ-** কোডমিন্যান্সের একটি ক্লাসিক্যাল উদাহরণ হলো খাটো শিংওয়ালা জাতের গরুর গাত্রর্বণ। এ জাতের গরুর গাত্রবর্ণ লাল, সাদা ও রোয়ান (roan) হয়ে থাকে। রোয়ান গরুর নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রতিটি লোম রোয়ান নয়, এদের কিছু লোম সাদা এবং কিছু লোম লাল। এ লাল এবং সাদা রঙের লোমের কম্বিনেসনের সার্বিক ফলাফলে রোয়ান রঙের আবির্ভাব ঘটে। প্রকৃতপক্ষে লাল ও সাদা বর্ণ নির্ধারক অ্যালিলদ্বয় কোডমিন্যান্ট হওয়ার কারণে এদের সংকরায়নে $F_1$ বংশের সকল গরু রোয়ানবর্ণ হয় এবং $F_2$ বংশে ১ ঃ ২ঃ ১ অনুপাতে লাল, রোয়ান এবং সাদা ফিনোটাইপে প্রকাশ পায় যা সাদা এবং লাল গরুর ক্রসে উৎপন্ন $F_1$ এবং $F_2$ বংশ দেখানো হলো-

মনে করি, $C^RC^R$ = লোমের লালবর্ণ নির্ধারক অ্যালিল,

$C^WC^W$ = লোমের সাদা বর্ণ নির্ধারক অ্যালিল

পিতা-মাতা

ফিনোটাইপঃ লাল গরু × সাদা গরু

জিনোটাইপঃ $C^RC^R$ $C^WC^W$

গ্যামিটঃ $C^R$ $C^R$ $C^W$ $C^W$

$F_1$ জনুঃ $C^RC^W$ $C^RC^W$ $C^RC^W$ $C^RC^W$

$F_1$ জনুর ফিনোটাইপঃ রোয়ান গরু

$F_1$ জনুর মধ্যে ক্রস

ফিনোটাইপঃ রোয়ান গরু × রোয়ান গরু

জিনোটাইপঃ $C^RC^W$ $C^RC^W$

গ্যামিটঃ $C^R$ $C^W$ $C^R$ $C^W$

$F_2$ জনুঃ

| স্ত্রীগ্যামিট ↓ / পুংগ্যামিট → | $C^R$ | $C^W$ |
|---|---|---|
| $C^R$ | $C^RC^R$ লাল গরু | $C^RC^W$ রোয়ান গরু |
| $C^W$ | $C^RC^W$ রোয়ান গরু | $C^WC^W$ সাদা |

$F_2$ জনুর ফিনোটাইপঃ লাল ঃ রোয়ান ঃ সাদা =১ঃ২ঃ১

**মারণ জিন বা (Lethal Gene)-** ২ ঃ ১ অনুপাতটি মেন্ডেলের ১ম সূত্রের একটি ব্যতিক্রম। লিথাল জিনের কারণে মেন্ডেলের ১ম সূত্রের ৩ ঃ ১ ফিনোটাইপিক অনুপাত পরিবর্তিত হয়ে ২ ঃ ১ অনুপাতে পরিণত হয়। হোমোজাইগাস অবস্থায় কোন জিন জীবের মৃত্যুর কারণ হলে সে জিনকে মারণ জিন বা লিথাল জিন বলে। ফরাসি বংশগতিবিদ ক্যুয়েনো (Cuenot) সর্বপ্রথম লক্ষ করেন যে, দুটি হলুদাভ (yellowish) রঙের ইঁদুরের প্রজননে ২ঃ১ অনুপাতে যথাক্রমে হলুদাভ এবং হলুদবিহীন রঙের ইঁদুর পাওয়া যায়। অন্যান্য গবেষকের গবেষণায় আরো দেখা গেল, হলুদাভ দুটি ইঁদুরের প্রজননে প্রাপ্ত শাবক সংখ্যা, হলুদাভ এবং হলুদবিহীন ইঁদুরের প্রজননে প্রাপ্ত শাবক সংখ্যার তুলনায় প্রায় ১/৪ অংশ কম। উল্লিখিত দুটি তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রমাণিত হয় যে, হলুদ রং এর জন্য দায়ী জিন হোমাজাইগাস অবস্থায় থাকলে সে জাইগোট বেঁচে থাকতে পারে না এবং জন্মের পূর্বেই মারা যায়। হলুদাভ স্ত্রী ইঁদুরের গর্ভে মৃত ভ্রূণ পাওয়ার মধ্যে উপরিউক্তি ব্যাখ্যার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মনেকরি, হলুদাভ এর জন্য দায়ী প্রকট জিন = $A^Y$ এবং হলুদবিহীন (মেটে রঙের) লোম এর জন্য দায়ী প্রচ্ছন্ন জিন = a। বিষয়টি নিম্নে দেখানো হলো-

পিতা-মাতা

ফিনোটাইপঃ হলুদাভ ইঁদুর × মেটে রঙের ইঁদুর

জিনোটাইপঃ $A^Y A^Y$ aa

গ্যামিটঃ $A^Y$ $A^Y$ a a

$F_1$ জনুঃ $A^Ya$ $A^Ya$ $A^Ya$ $A^Ya$

$F_1$ জনুর ফিনোটাইপঃ সবগুলোই হলুদাভ ইঁদুর

$F_1$ জনুর মধ্যে ক্রস

ফিনোটাইপঃ হলুদাভ ইঁদুর × হলুদাভ ইঁদুর

জিনোটাইপঃ $A^Ya$ $A^Ya$

গ্যামিটঃ $A^Y$ a $A^Y$ a

$F_2$ জনুঃ

| পুংগ্যামিট / স্ত্রীগ্যামিট | $A^Y$ | a |
|---|---|---|
| $A^Y$ | $A^YA^Y$ মৃত | $A^Y$ a হলুদাভ ইঁদুর |
| a | $A^Y$ a হলুদাভ ইঁদুর | a a মেটে রঙের ইঁদুর |

$F_2$ জনুর ফিনোটাইপঃ হলুদাভ ইঁদুরঃ মেটে রঙের ইঁদুর = ২ঃ১

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | ‘ক’ সন্তানের রক্ত গ্রুপ B, মাতার রক্ত গ্রুপ A। পিতার রক্তগ্রুপ AB হওয়া কি সম্ভব? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করুন। |
|---|---|
| | |

**সারসংক্ষেপ**

একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দুইটি জীবের মধ্যে ক্রস করলে প্যারেন্টের বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের কোনোটিই প্রকট বা প্রচ্ছন্ন না হলে ১ম অপত্য বংশে এদের কোনটিই প্রকাশ না পেয়ে উভয় বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে একটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে। তবে ১ম ও ২য় অপত্য বংশে জিনোটাইপের কোন পরিবর্তন ঘটবে না। এরূপ, প্যারেন্টের বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের কোনোটা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন না হলে একে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলা হয় এবং অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিনগুলোকে ইন্টারমিডিয়েট জিন বলে। অনেক ক্ষেত্রে হেটারোজাইগাস অবস্থায় কোন অ্যালিল প্রকট না হওয়ার কারণে দুই বা অধিক অ্যালিল সম্পূর্ণ প্রকটতা বা প্রচ্ছন্নতা প্রদর্শন করে না। এ অবস্থায় উভয় অ্যালিল নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্য হেটারোজাইগোটের ফিনোটাইপ সমভাবে প্রকাশিত হয়। এরূপ জিনকে কোডমিন্যান্ট জিন এবং প্রপঞ্চকে সমপ্রকটতা বলা হয়। হোমোজাইগাস অবস্থায় কোন জিন জীবের মৃত্যুর কারণ হলে সে জিনকে মারণ জিন বা লিথাল জিন বলে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ১১.২

বহুনির্বচনি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি লিথাল জিনের অনুপাত

ক. ১ঃ২ খ. ২ঃ১

গ. ৩ঃ১ ঘ. ৯ঃ৭

২। অসম্পূর্ণ প্রকটতার বৈশিষ্ট্য হলো-

i. এতে প্রকট জিন ঠিক ভাবে কাজ করে না

ii. এতে প্রচ্ছন্ন জিন ঠিক ভাবে কাজ করে

iii. দুটি জিনই সমানভাবে কাজ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. I, ii ও iii

৩। ববি ও কবির এর ২য় বংশে একই রকম জিনের অবস্থানের কারণে একজন নাতি মারা গেলেন। জিনটির নাম কি?

ক. হোমোজাইগাস খ. লিথাল

গ. হেটারোজাইগাস ঘ. হোমোলোগাস

## পাঠ-১১.৩ মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রমসমূহ (দ্বিতীয় সূত্র ৯:৭ ও ১৩:৩)

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি–**

- পরিপূরক জিনের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- এপিস্ট্যাসিস সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রকট এপিস্ট্যাসিস এর ফলাফল উল্লেখ করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **প্রধান শব্দ** | পরিপূরক জিন, এপিস্ট্যাসিস |

**পরিপূরক জিন (Complementary Gene): ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ ঃ ৭-** ভিন্ন ভিন্ন লোকোসে অবস্থিত দুটি প্রকট জিনের উপস্থিতির কারণে যদি জীবের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তবে সংশ্লিষ্ট জিনদ্বয়কে পরিপূরক জিন বলা হয়। পরিপূরক জিন ক্রিয়ার ফলে মেন্ডেলের ২য় সূত্রের ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ঃ ৩ঃ ৩ঃ১ পরিবর্তিত হয়ে ৯ঃ৭ অনুপাত প্রকাশ পায়। মানুষের মূক-বধিরতা বা ডেফ-মিউটিজম (deaf-mutism) বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিপূরক জিন ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট ৯ঃ৭ অনুপাতটি ব্যাখ্যা করা হলো-

দেখা যায়, যে সব মানুষ কালা/বধির (deaf; কানে শুনেনা) হয় তারা সাধারণত মূক/বোবা (বাকশক্তিহীন; mute)ও হয়। মানুষের এমন অস্বাভাবিকতাকে বলা হয় মূক-বধিরতা (deaf-mutism)। জিনগত বিশ্লেষণে বুঝা যায় স্বাভাবিক শ্রুতি ও কথা বলার ক্ষমতার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দুটি প্রকট জিনের ভূমিকা আছে। এই ভিন্ন ভিন্ন দুটি প্রকট জিনের কার্য পরস্পরের পরিপূরক। অর্থাৎ প্রকট জিন দুটির প্রত্যেকের অন্তত একটি করে জিন না থাকলে মানুষ বোবা-কালা (deaf-mute) হয়।

ধরা যাক, স্বাভাবিক অবস্থা অর্থাৎ শ্রবণক্ষমতা ও বাকশক্তির জন্য দায়ী প্রকট জিন দুটি A এবং B। সুত্রানুযায়ী aaBB জিনোটাইপ সম্পন্ন ব্যক্তি মূক-বধির হবে। অনুরূপভাবে, AAbb জিনোটাইপ সম্পন্ন ব্যক্তিও মূক-বধির হবে।

উল্লিখিত দুটি জিনোটাইপের দুই জন মূক-বধির স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ হলে তাদের সকল সন্তান সন্ততি স্বাভাবিক শ্রবণ ও বাকশক্তি সম্পন্ন হয়। সভ্য মানব সমাজে সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীতে বিবাহ সম্পর্ক প্রচলিত না থাকায় দুইজন হেটারোজাইগাস স্ত্রী-পুরুষের বিবাহঘটিত সন্তান-সন্ততিতে ঐ বৈশিষ্ট্যের অনুপাত প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না। তবে ইঁদুর, গিনিপিগ ও অন্যান্য প্রাণীতে অনুরূপ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বংশগতি পরীক্ষা করে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে দুজন হেটারোজাইগাস স্বাভাবিক শ্রবণ-বাকশক্তি সম্পন্ন স্ত্রী পুরুষের সন্তান-সন্ততির মধ্যে ৯ ঃ৭ অনুপাত যথাক্রমে স্বাভাবিক শ্রবণ-বাকশক্তি এবং মূক-বধির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে।

পিতা-মাতা
ফিনোটাইপঃ মূক-বধির × মূক-বধির
জিনোটাইপঃ AAbb aaBB
গ্যামিট ঃ Ab Ab aB aB

$F_1$ জনু ঃ AaBb AaBb AaBb AaBb
$F_1$ ফিনোটাইপঃ সকলেই স্বাভাবিক (শ্রবণক্ষমতা ও বাকশক্তিসম্পন্ন)

$F_1$ জনুর বংশধরদের মধ্যে প্রজনন ঃ
ফিনোটাইপঃ স্বাভাবিক শ্রবণ ও বাকশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন × স্বাভাবিক শ্রবণ ও বাকশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন
জিনোটাইপঃ AaBb AaBb
গ্যামিট ঃ AB Ab aB ab AB Ab aB ab

$F_2$ জনু ঃ

| পুংগ্যামিট / স্ত্রীগ্যামিট | AB | Ab | aB | ab |
|---|---|---|---|---|
| AB | AABB<br>স্বাভাবিক শ্রবণ ও বাকশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন | AABb<br>স্বাভাবিক শ্রবণ ও বাকশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন | AaBB<br>স্বাভাবিক শ্রবণ ও বাকশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন | AaBb<br>স্বাভাবিক শ্রবণ ও বাকশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন |
| Ab | AABb<br>স্বাভাবিক শ্রবণ ও বাকশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন | AAbb মূক-বধির | AaBb<br>স্বাভাবিক শ্রবণ ও বাকশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন | Aabb<br>মূক-বধির |
| aB | AaBB<br>স্বাভাবিক শ্রবণ ও বাকশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন | AaBb<br>স্বাভাবিক শ্রবণ ও বাকশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন | aaBB মূক-বধির | aaBb<br>মূক-বধির |
| ab | AaBb<br>স্বাভাবিক শ্রবণ ও বাকশক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন | Aabb মূক-বধির | aaBb<br>মূক-বধির | aabb<br>মূক-বধির |

$F_2$ ফিনোটাইপঃ স্বাভাবিক (শ্রবণক্ষমতা ও বাকশক্তিসম্পন্ন) ৯ ঃ মূক-বধির ৭।

$F_1$ ফলাফল বিশ্লেষণ প্রতীয়মান হয় যে সকল জাইগোটে অন্তত একটি করে উভয় প্রকট জিন উপস্থিত তারাই স্বাভাবিক শ্রবণ ও বাকশক্তিসম্পন্ন। অর্থাৎ, A ও B জিনদ্বয় পরস্পরের পরিপূরক। A এবং B জিনের একক উপস্থিতিতে মূক ও বধির হয়।

**এপিস্ট্যাসিস (Epistasis)-** সাধারণত প্রকট জিন এর উপস্থিতিতে হেটারোজাইগোটে এর প্রচ্ছন্ন অ্যালিলের বৈশিষ্ট্য অপ্রকাশিত থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ক্রোমোসোমের ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি জিন জীবের একই অঙ্গ বা বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং এক লোকাসে অবস্থিত অন্য একটি জিন এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা প্রদান করে। ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত জিন ইন্টারঅ্যাকসনের এ প্রক্রিয়ায় বাধা প্রদানকারী জিনকে এপিস্ট্যাটিক (epistatic) বা বাধক জিন এবং বাধাগ্রস্থ জিনটিকে হাইপোস্ট্যাটিক (hypostatic) জিন বলে। ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত নন-অ্যালিলিক (non-allelic) জিন যখন অন্য জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধাদান করে তখন এ প্রপঞ্চকে (phenomenon) এপিস্ট্যাসিস বলা হয়। এপিস্ট্যাসিস প্রকৃতপক্ষে ৪ প্রকার। যথা- প্রকট এপিস্ট্যাসিস, প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস, ডুপ্লিকেট প্রকট এপিস্ট্যাসিস, ডুপ্লিকেট প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস।

**প্রকট এপিস্ট্যাসিস (Dominant Epistasis): ফিনোটাইপিক অনুপাত ১৩ ঃ ৩- ১৩ঃ৩** অনুপাতটি মেন্ডেলের ২য় সূত্রের একটি ব্যতিক্রম। প্রকট এপিস্ট্যাসিসের কারণে মেন্ডেলের ২য় সূত্রের ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ পরিবর্তিত হয়ে ১৩ঃ৩ অনুপাতে প্রকাশ পায়। একই বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ক্রোমোসোমের এক লোকাসে অবস্থিত কোন প্রকট জিন যদি ক্রোমোসোমের অন্য লোকাসে অবস্থিত অন্য একটি প্রকট জিন এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা সৃষ্টি করে তা হলে এ প্রক্রিয়াকে প্রকট এপিস্টাসিস বলে।

সাদা লেগহর্ন (white leghorn) ও সাদা প্লিমাউথ রক (plymouth rock) মোরগ-মুরগীর মধ্যে ১৩ঃ৩ ফিনোটাইপক অনুপাত পাওয়া যায়। সাদা লেগহর্ণ মুরগিতে রঙিন পালকের জন্য প্রকট জিন থাকা সত্ত্বেও রঞ্জক পদার্থ উৎপাদনে বাধা প্রদানকারী অন্য একটি প্রকট জিন এর উপস্থিতির জন্য পালকগুলো সাদা হয়। অপরপক্ষে সাদা প্লিমাউথ রক মুরগীতে রঞ্জক পদার্থ উৎপাদনে বাধা প্রদানকারী কোন প্রকট জিন না থাকা সত্ত্বেও সাদা হয়।

মনে করি, C একটি প্রকট জিন যা লেগহর্ণ মোরগ-মুরগির রঙিন পালকের জন্য দায়ী। আরও মনে করি, I অন্য একটি প্রকট জিন যা রঞ্জক পদার্থ উৎপাদনে বাঁধা সৃষ্টি করে। অতএব সাদা লেগহর্ন মোরগ-মুরগীর জিনোটাইপ CCII এবং সাদা প্লিমাউথ রক মোরগ-মুরগীর জিনোটাইপ ccii হবে। একটি সাদা লেগহর্ন মোরগ ও একটি প্লিমাউথ রক মুরগীর মধ্যে যৌন মিলন ঘটালে নিম্নরূপ ফলাফল পাওয়া যায় যাতে প্রমাণিত হয়, প্রকট এপিস্ট্যাটিক জিন এর কারণে $F_2$ জনুতে ৯ঃ৩ঃ৩ঃ১ অনুপাতের পরিবর্তে ১৩ঃ৩ অনুপাতে সাদা ও রঙিন পালক সম্পন্ন মোরগ-মুরগী পাওয়া যায়।

পিতা-মাতা

ফিনোটাইপঃ সাদা লেগহর্ন X সাদা প্লিমাউথ রক

জিনোটাইপঃ CCII ccii

গ্যামিট ঃ CI CI ci ci

$F_1$ জনু ঃ CcIi CcIi CcIi CcIi

$F_1$ ফিনোটাইপঃ সকলই সাদা লেগহর্ন

$F_1$ জনুর বংশধরদের মধ্যে প্রজনন ঃ

ফিনোটাইপঃ সাদা লেগহর্ন X সাদা লেগহর্ন

জিনোটাইপঃ CcIi CcIi

গ্যামিট ঃ CI Ci cI ci CI Ci cI ci

$F_2$ জুঃ

| পুংগ্যামিট / স্ত্রীগ্যামিট | CI | Ci | cI | ci |
|---|---|---|---|---|
| CI | CCII | CCIi | CcII | CcIi |
| Ci | CCIi | CCii<br>রঙিন | CcIi | Ccii<br>রঙিন |
| cI | CcII | CcIi | ccII | ccIi |
| ci | CcIi | Ccii<br>রঙিন | ccIi | ccii |

$F_2$ ফিনোটাইপঃ সাদা লেগহর্ন ১৩ঃ রঙিন পালক ৩

সংশ্লিষ্ট প্যানেট চেকার বোর্ডে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তিনটি গ্রুপের ফিনোটাইপ একই অর্থাৎ সাদা এবং ফিনোটাইপ দেখে এদের জিনোটাইপের স্বতন্ত্র বুঝা যায় না। কারণ,

১। ৯/১৬ অংশ পাখিতে রঙিন পালকের (C) ও রং সৃষ্টিতে বাধা প্রদানকারী (I) এই উভয় প্রকারের প্রকট জিনই উপস্থিত এবং যেহেতু বাঁধা প্রদানকারী জিনটি (I) এপিস্ট্যাটিক অতএব এ পাখিগুলো সাদা।

২। অপরদিকে ৩/১৬ অংশ পাখিতে রঙিন পালকের জিন (C) অনুপস্থিত। তদুপরি রং সৃষ্টিতে বাধা প্রদানকারী এপিস্ট্যাটিক জিন (I) উপস্থিত। অতএব এই পাখিগুলো সাদা হবে।

৩। ১/১৬ অংশ পাখিতে রং সৃষ্টিতে বাধা প্রদানকারী এপিস্ট্যাটিক জিন (I) অনুপস্থিত কিন্তু রঙিন পালকের জন্য দায়ী জিন (C) না থাকায় এগুলো সাদা হবে।

অবশিষ্ট ৩/১৬ অংশ পাখিতে রঙিন পালকের জন্য প্রকট জিন (C) আছে এবং রং সৃষ্টিতে বাধা প্রদানকারী কোন এপিস্ট্যাটিক প্রকট জিন (I) নাই। এ কারণে এ পাখিগুলো রঙিন পালক সম্পন্ন হয়। উপরিউক্ত ক্রসে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এপিস্ট্যাটিক জিনটি প্রকট হওয়া সত্ত্বেও ফিনোটাইপে এর কোন প্রকাশ নাই। এ ধরনের এপিস্ট্যাটিক জিনকে বাধক জিন (Inhibiting gene) বলে।

| | |
|---|---|
| **শিক্ষার্থীর কাজ** | মিষ্টি মটরের দুটি সাদা ফুল এর ক্রসে ২য় বংশধরে গোলাপী ও সাদা ফুলের অনুপাত ৯ঃ৭ পাওয়া গেছে। একটি ফুলের জিনোটাইপ CCpp অপর ফুলের জিনোটাইপ ccPP। ডবল প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস এর ক্ষেত্রে বিষয়টি চেকার বোর্ডের মাধ্যমে লিখে ক্লাসে উপস্থাপন করবেন। |
| | |

## সারসংক্ষেপ

ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রকট জিনের উপস্থিতির কারণে যদি জীবের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তবে সংশ্লিষ্ট জিনদ্বয়কে পরিপূরক জিন বলা হয়। পরিপূরক জিন ক্রিয়ার ফলে মেন্ডেলের ২য় সূত্রের ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ঃ ৩ঃ ৩ঃ১ পরিবর্তিত হয়ে ৯ঃ৭ অনুপাত প্রকাশ পায়। ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত জিন ইন্টারঅ্যাকসনের এ প্রক্রিয়ায় বাধা প্রদানকারী জিনকে এপিস্ট্যাটিক বা বাধক জিন এবং বাঁধাগ্রস্থ জিনটিকে হাইপোস্ট্যাটিক জিন বলে। ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত নন-অ্যালিলিক জিন যখন অন্য জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধাদান করে তখন এ প্রপঞ্চকে এপিস্ট্যাসিস বলা হয়। এপিস্ট্যাসিস প্রকৃতপক্ষে ৪ প্রকার। যথা- প্রকট এপিস্ট্যাসিস, প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস, ডুপ্লিকেট প্রকট এপিস্ট্যাসিস এবং ডুপ্লিকেট প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস। প্রকট এপিস্ট্যাসিসের কারণে মেন্ডেলের ২য় সূত্রের ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ঃ৩ঃ৩ঃ১ পরিবর্তিত হয়ে ১৩ঃ৩ অনুপাতে প্রকাশ পায়। একই বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী, ক্রোমোসোমের এক লোকাসে অবস্থিত কোন প্রকট জিন যদি ক্রোমোসোমের অন্য লোকাসে অবস্থিত অন্য একটি প্রকট জিন এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাঁধা সৃষ্টি করে তা হলে এ প্রক্রিয়াকে প্রকট এপিস্টাসিস বলে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩

**বহু নির্বাচনি প্রশ্ন**

১। প্রকট এপিস্ট্যাসিস এর অনুপাত নিচের কোনটি?

ক. ৯ঃ৩ঃ৩ঃ১ খ. ২ঃ১

গ. ৩ঃ১ ঘ. ৯ঃ৭

২। এপিস্ট্যাসিস প্রকারগুলো-

i. প্রকট এপিস্ট্যাসিস

ii. প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস

iii. ডুপ্লিকেট প্রকট ও প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। সাদা লেগহর্ন (CCII) × সাদা প্লিমাউথ রক (ccii) এর ফলে প্রথম বংশে জিনোটাইপ হবে?

ক. CcIi খ. CCIi

গ. CcII ঘ. CCii

## পাঠ-১১.৪ লিঙ্গ নির্ধারণ কৌশল

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি–**

- লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- মানুষের ক্রোমোসোম এর প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।
- লিঙ্গ নির্ধারণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **প্রধান শব্দ** | অটোসোম, সেক্স ক্রোমোসোম, হেটারোগ্যামিসিস |

**লিঙ্গ নির্ধারণ (Sex determination)-** লিঙ্গ নির্ধারণ সম্পর্ক ৩টি বিজ্ঞানসম্মত ভ্রূণতাত্ত্বিক মতবাদের মধ্যে সিনগ্যামিক লিঙ্গ নির্ধারণ মতবাদ (syngamic sex determination) বর্তমানে প্রায় বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত। এই মতানুসারে নিষেককালেই লিঙ্গ নির্ধারণ হয়ে যায়। সিনগ্যামিক ভ্রূণতাত্ত্বিক লিঙ্গ সম্পর্কে ক্রিয়া-কৌশলগুলোর মধ্যে ক্রোমোসোম নিয়ন্ত্রিত লিঙ্গ নির্ধারণ (chromosome theory of sex determination) আধুনিক বলে বিবেচনা করা হয়। ক্রোমোসোম নিয়ন্ত্রিত লিঙ্গ নির্ধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলত ক্রোমোসোমের সাহায্যে লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। ক্রোমোসোম নিয়ন্ত্রিত কলা-কৌশলগুলোর মধ্যে হেটারোগ্যামিসিস বা সেক্স ক্রোমোসোম দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারণ (heterogamesis or sex determination by sex chromosome) কৌশলটি প্রধান।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে Pyrrhocoris নামক কুমড়ো পোকার স্পার্মাটোজেনেসিস পর্যবেক্ষণকালে জার্মান জীববিজ্ঞান H.Henking লক্ষ করেন যে, অর্ধেক সংখ্যক শুক্রাণুতে একটি ক্রোমোসোম বর্তমান এবং তিনি এই অতিরিক্ত ক্রোমোসোমের নামকরণ করেন X বডি। আমেরিকান জীববিজ্ঞানী Clarenee E. McClung, ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে X ক্রোমোসোমটির লিঙ্গ নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ করেন। কারণ, তিনি প্রত্যক্ষ করেন যে, স্ত্রী ঘাসফড়িং (*Xiphidium fasciatum*) এর সোমাটিক কোষে ২৪টি ক্রোমোসোম থাকে, অথচ পুরুষ ঘাসফড়িং এর সেমিক কোষে মাত্র ২৩টি ক্রোমোসোম বর্তমান। এর তিন বছর পর ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকান বায়োলজিস্ট Nettie Stevens বিভিন্ন পতঙ্গের স্পার্মাটোজেনেসিস ও উওজেনেসিসের উপর গবেষণা করে সর্বপ্রথম ক্রোমোসোম দ্বারা লিঙ্গ নির্ধারণের কৌশল সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদান করেন। প্রায় একই সময়ে এডমন্ড বি.উইলসন কয়েকটি পতঙ্গে একই পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণের কৌশল বর্ণনা করেন। তাঁদের অভিমত ব্রীজ, গোল্ডস্মীথ ও হুইটিংস নামক প্রখ্যাত বিজ্ঞানীগন সমর্থন করেন। X ক্রোমোসোমটি লিঙ্গ নির্ধারণে সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করে বলে তাকে সেক্স ক্রোমোসোম বা হেটারোসোম নামে অভিহিত করা হয়।। স্টিভেন্স লক্ষ করেন যে, স্ত্রী পতঙ্গের সোমাটিক কোষে X ক্রোমোসোমসহ সকল ক্রোমোসোম বর্তমান কিন্তু পুরুষ পতঙ্গে X ক্রোমোসোমের কোন হোমোলোগাস সাথী (অর্থাৎ আরেকটি X ক্রোমোসোম) না থেকে ভিন্ন আকৃতির একটি সাথী থাকে। স্টিভেন্স X ক্রোমোসোমের এই নন-হোমোলোগাস সাথীকে ক্রোমোসোম Y নামে অভিহিত করেন। অতএব, সোমাটিক কোষের ক্রোমোসোমগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

**১। অটোসোম (Autosome)-** সোমাটিক বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ক্রোমোসোমসমূহকে অটোসোম বলা হয়। লিঙ্গ নির্ধারণে এদের প্রত্যক্ষ কোন সম্পর্ক নেই। এদেরকে ইংরেজি 'A' দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

**২। সেক্স-ক্রোমোসোম/হিটারোসোম (Sex chromosome/Heterosome)-** লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ক্রোমোসোম।

মহিলাদের গ্যামিটে শুধুমাত্র X ক্রোমোসোম থাকে তাই এদেরকে হোমোগ্যামিটিক সেক্স ও গ্যামিটকে হোমোগ্যামিট বলে। অপরদিকে পুরুষে দুই ধরনের গ্যামিট সৃষ্টি হয় (X ও Y) তাই এদেরকে হেটারোগ্যামিটিক সেক্স ও গ্যামিটকে হেটারোগ্যামিট বলে।

**পুরুষে হেটারোগ্যামিসিস প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ নির্ধারণ প্রক্রিয়া নিম্নে দেখানো হলো-**

১। XX-XY পদ্ধতি- এই পদ্ধতিতে মানুষ, ড্রসোফিলা, মাছি ও লিগিয়াস পতঙ্গ এবং মেলানড্রিয়াম, *Humulus lupulus, Coccinina indica* উদ্ভিদসহ বিভিন্ন জীবে এই প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ নির্ধারিত হয়। স্ত্রী জীবে দুইটি X ক্রোমোসোম বিদ্যমান। এদের সংকেত XX। ফলে সকল ডিম্বাণুতে একটি করে X ক্রোমোসোম থাকে। পুরুষদের একটি X ক্রোমোসোম ও একটি Y ক্রোমোসোম থাকে অর্থাৎ এদের সংকেত XY। X ক্রোমোসোম বহনকারী কোন শুক্রাণু যদি ডিম্বাণুকে নিষেক করে তবে অপত্য বংশধর স্ত্রী এবং Y ক্রোমোসোম বহনকারী কোন শুক্রাণু যদি ডিম্বাণু নিষিক্ত করে তবে বংশধর পুরুষ হবে। নিম্নে ক্রসের মাধ্যমে এটি দেখানো হলো-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ফিনোটাইপঃ | পিতা | × | মাতা | | |
| জিনোটাইপঃ | 2A + XY | | 2A+XX | | |
| গ্যামিটঃ | A+Y | A+X | A+X | A+X | |
| $F_1$ জিনোটাইপঃ | 2A+XX | | 2A+XY | | |
| $F_1$ ফিনোটাইপঃ | কন্যা | | পুত্র | | |

২। XX-XO পদ্ধতি- কিছু কিছু উদ্ভিদ (যথা-*Vallisnaria spiralis, Dioscorea simuata*) এবং ঘাস ফড়িং, গান্ধি পোকা, আরশোলা ইত্যাদি পতঙ্গদের স্ত্রীরা হোমোগ্যামিটিক। এদের XX ক্রোমোসোম থাকায় প্রতিটি ডিম্বাণু একটি X ক্রোমোসোম বহন করে। অপরপক্ষে, পুরুষ প্রাণীদের একটি মাত্র X ক্রোমোসোম থাকে, কোন Y ক্রোমোসোম থাকে না। Y ক্রোমোসোমের অনুপস্থিতি একটি শূন্য O (zero) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। অতএব, এদের সংকেত XO। এদের অর্ধেক শুক্রাণুতে একটি X ক্রোমোসোম থাকে এবং বাকী অর্ধেক শুক্রাণুতে কোন X ক্রোমোসোম থাকে না। X ক্রোমোসোম বহনকারী কোন শুক্রাণু যদি ডিম্বাণু নিষিক্ত করে তবে অপত্য বংশধর স্ত্রী এবং X ক্রোমোসোমবিহীন কোন শুক্রাণু যদি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে তবে অপত্য বংশধর পুরুষ হয়। নিম্নের ক্রস দ্বারা তা বুঝানো হলো-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ফিনোটাইপঃ | পিতা | × | মাতা | | |
| জিনোটাইপঃ | 2A + XO | | 2A+XX | | |
| গ্যামিটঃ | A+O | A+X | A+X | A+X | |
| $F_1$ জিনোটাইপঃ | 2A+XX | | 2A+XO | | |
| $F_1$ ফিনোটাইপঃ | কন্যা | | পুত্র | | |

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | নিচের ছকে মানুষের লিঙ্গ পদ্ধতির নামগুলো লিখুন। |
|---|---|
| | |

**সারসংক্ষেপ**

ক্রোমোসোম নিয়ন্ত্রিত লিঙ্গ নির্ধারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূলত ক্রোমোসোমের সাহায্যে নির্ধারিত হয়। সোমাটিক কোষের ক্রোমোসোমগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অটোসোম ও সেক্স-ক্রোমোসোম/হেটারোসোম। পুরুষে হেটারোগ্যামিসিস প্রক্রিয়ায় লিঙ্গ নির্ধারণ প্রক্রিয়া হলো- XX-XY পদ্ধতি ও XX-XO পদ্ধতি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। মানুষের লিঙ্গ নির্ধারণের প্রধান কৌশল নিচের কোনটি?

ক. হোমোগ্যামিসিস খ. হেটারোগ্যামিসিস
গ. সিনগ্যামিসিস ঘ. কোনটিই নয়

২। সোমাটিক কোষের ক্রোমোসোম-

i. অটোসোম
ii. সেক্স ক্রোমোসোম
iii. হোমোলোগাস ক্রোমোসোম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i , ii ও iii

৩। XX-XO পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারিত হয় নিচের কোনটির?

ক. তেলাপোকা খ. কৈ মাছ
গ. গরু ঘ. হাঁস

## পাঠ-১১.৪ মানুষের লিঙ্গ সংযুক্তি বৈশিষ্ট্য

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি–**

- মানুষের সেক্স লিঙ্কড জিন ও লিঙ্গ সংযুক্তি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সেক্স লিঙ্কড প্রচ্ছন্ন জিনের বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখ করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **প্রধান শব্দ** | সেক্স লিঙ্কড জিন, মায়োপিয়া |

**সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার (Sex Linked Disorder)-** মানুষের প্রতি কোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোসোম পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২২ জোড়া অটোসোম যারা দেহের সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। বাকি এক জোড়া X ও Y ক্রেমোসোম লিঙ্গ নির্ধারণ করে। তাই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি নিয়ন্ত্রণকারি যে সকল জিন কেবলমাত্র সেক্স ক্রোমোসোমে উপস্থিত থাকে সে সকল জিনকে সেক্স লিঙ্কড জিন (Sex Linked Gene) বলে। ক্রোমোসোমের এসকল সেক্স লিঙ্কড জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে সেক্স লিঙ্কড জিন বা লিঙ্গ সংযুক্তি বৈশিষ্ট্য (Sex Linked Character) বলে। সেক্স ক্রোমোসোম বা X ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিন গুলোকে সেক্স লিঙ্কড জিন (sex linked gene) বলে। সেক্স লিঙ্কড জিন দ্বারা সৃষ্ট অসুবিধা বা বিশৃঙ্খলাকে সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার বা লিঙ্গ জড়িত অস্বাভাবিকতা বলে। সেক্স লিঙ্কড জিনের বংশগতি অটোসোমে অবস্থিত জিনের বংশগতি থেকে ভিন্ন। সেক্স ক্রোমোসোম বা X ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনগুলো X ক্রোমোসোমের মাধ্যমেই বংশ পরম্পর সর্বদা পিতা থেকে কন্যা এবং মাতা থেকে পুত্রে সঞ্চারিত হয়। এ বিশেষ বংশগতিধারার পদ্ধতিকে সেক্স লিঙ্কড বংশগতি (sex linked inheritance) বলা হয়। মানুষে এ পর্যন্ত প্রায় ৫৬ ধরনের সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেক্স লিঙ্কপ্রচ্ছন্ন জিন মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে এবং হিমোফিলিয়া, বর্ণান্ধতা, রাতকানা ইত্যাদি রোগ সৃষ্টি করে। নিম্নে সেক্স লিঙ্ক প্রচ্ছন্ন জিনের বংশগতীয় বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখ করা হলো-

- বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারি জিন শুধু X ক্রোমোসোমে উপস্থিত থাকে, Y ক্রোমোসোমে থাকে না।
- মহিলার চেয়ে পুরুষে এ বৈশিষ্ট্য বেশি প্রকাশিত হয়। কারণ মহিলার দুটি X ক্রেমোসোম দুটি প্রচ্ছন্ন জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকলে তবেই এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়। অপরদিকে পুরুষে যেহেতু একটি X ক্রোমোসোম থাকে এবং এতে একটি প্রচ্ছন্ন জিন থাকলেই বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়।
- সেক্স লিঙ্কড প্রচ্ছন্ন জিন মাতা হতে কন্যা বা পুত্রে সঞ্চারিত হতে পারে। তবে পিতা হতে শুধুমাত্র কন্যাতে সঞ্চারিত হয়, কখনোই পুত্রে সঞ্চারিত হয় না। কারণ পুত্ররা পিতা হতে শুধু Y ক্রোমোসোমপ্রাপ্ত হয় এবং পুত্রের X ক্রোমোসোম শুধু মাতা হতে আসে।

নিচের ছকে পরিচিত কয়েকটি প্রচ্ছন্ন সেক্স লিঙ্কড বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ ও লক্ষণ দেয়া হলো-

| বৈশিষ্ট্য | লক্ষণ |
|---|---|
| বর্ণান্ধতা | বিভিন্ন বর্ণের পার্থক্য বুঝতে না পারা |
| রাতকানা | স্বল্প আলোতে কোনো জিনিস দেখতে অসুবিধা বোধ করা |
| হিমোফিলিয়া | রক্ত তঞ্চনে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ |
| মায়োপিয়া | কাছের জিনিস ভালো না দেখা |
| অপটিক এ্যাট্রোফি | অপটিক নার্ভের ক্ষয়িষ্ণুতা |
| এক্টোডার্মাল ডিসপ্লেসিয়া | লোম, দাঁত ও ঘর্ম গ্রন্থির অনুপস্থিতি |
| জুভেনাইল গ্লুকোমা | চক্ষু গোলকের কাঠিন্য ও ছানি পড়া |

| | |
|---|---|
| ডুসিনি মাস্কুলার ডিসট্রোফি | পেশির জটিলতায় ১০ বছরেই চলন শক্তি লোপ |
| ইকথাইয়োসিস | অমসৃণ আঁইশময় ত্বক |
| হোয়াইট ফোরলক | মাথার চুল আংশিক সাদা হওয়া |

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | নিচের ছকে পাঁচটি প্রচ্ছন্ন সেক্স লিঙ্ক বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ লিখুন। | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**সারসংক্ষেপ**

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি নিয়ন্ত্রণকারি যে সকল জিন কেবলমাত্র সেক্স ক্রোমোসোমে উপস্থিত থাকে সে সকল জিনকে সেক্স লিঙ্কড জিন বলে। ক্রোমোসোমের এসকল সেক্স লিঙ্কড জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বৈশিষ্ট্যগুলোকে সেক্স লিঙ্কড জিন বা লিঙ্গ সংযুক্তি বৈশিষ্ট্য বলে। সেক্স ক্রোমোসোম বা X ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিনগুলোকে সেক্স লিঙ্কড জিন বলে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৫

**বহু নির্বাচনি প্রশ্ন**

১। *Human sapiens* এর প্রতি কোষে সেক্স ক্রোমোসোম কতটি?

ক. এক জোড়া　　খ. দুই জোড়া
গ. তিন জোড়া　　ঘ. চার জোড়া

২। সেক্স লিঙ্কড জিন অবস্থান করে-

i. সেক্স ক্রোমোসোমে
ii. X ক্রোমোসোমে
iii. Y ক্রোমোসোমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. i ও iii
গ. ii ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

৩। এক ব্যক্তির মাথার চুলের আংশিক সাদা হয়েছে। এটি কোন বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ?

ক. প্রচ্ছন্ন সেক্স লিঙ্কড জিনের　　খ. প্রকট সেক্স লিঙ্কড জিনের
গ. রাতকানার　　ঘ. মায়োপিয়ার

## পাঠ-১১.৬ মানুষের বংশগতিজনিত রোগসমূহ

**উদ্দেশ্য**

**এ পাঠ শেষে আপনি–**

- লাল সবুজ বর্ণান্ধতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হিমোফিলিয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।
- ডুশিনী মাসকুলার ডিসট্রোফি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ABO রক্ত গ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **প্রধান শব্দ** | বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া |

**লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (Red-green color blindness)-** মানুষের চোখের রেটিনায় বর্ণ সংবেদী কোণ কোষ উৎপাদনের জন্য একটি X লিঙ্কড জিন দরকার। মানুষের X ক্রোমোসোমে দুইটি জিন আছে যা চক্ষুর রেটিনায় বর্ণ সংবেদী কোষ গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোণ কোষ তিন ধরনের যাদের প্রত্যেকটির ধরন একেক বিশেষ রঙের প্রতি সংবেদনশীল। যেমন- লাল, সবুজ ও বেগুনি। কোণ কোষগুলো না থাকলে লাল ও সবুজ বর্ণ পৃথকভাবে চেনা যায় না। এ জিনের প্রচ্ছন্ন অ্যালিল বর্ণ সংবেদী কোষ গঠন ব্যাহত করে। ফলে লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা রোগের সৃষ্টি হয়। হোমোজাইগাস নারী (cc) ও পুরুষ (cY) লাল ও সবুজ বর্ণের সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। নারীর ক্ষেত্রে এ জিনটি হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন না হলে বর্ণান্ধতা প্রকাশিত হয় না। কিন্তু পুরুষে একটি প্রচ্ছন্ন জিনই সে বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সক্ষম। নিম্নে ক্রসের মাধ্যমে এর বংশগতি দেখানো হলো-

বর্ণান্ধ পুরুষ ও স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন নারীর মধ্যে বিয়ে হলে $F_1$ জনুর পুত্র বা কন্যা সবাই স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন হলেও কন্যাদের সবাই হবে বর্ণান্ধ জিনের বাহক এবং পরবর্তী বংশের অর্ধেকে এ জিন সঞ্চারিত হয়।

পিতামাতার ফিনোটাইপঃ বর্ণান্ধ পুরুষ × স্বাভাবিক নারী

পিতামাতার জিনোটাইপঃ $X^cY$ $X^+X^+$

গ্যামিটঃ $X^c$ Y $X^+$ $X^+$

$F_1$ জিনোটাইপঃ $X^+X^c$ $X^+X^c$ $X^+Y$ $X^+Y$

$F_1$ ফিনোটাইপঃ স্বাভাবিক কন্যা (২) স্বাভাবিক পুত্র (২)

$F_1$ জনুর সন্তানদের অনুরূপ জিনোটাইপধারী (কারণ মানুষে ভাই-বোনের বিয়ে হয় না) স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষের সাথে বর্ণান্ধবাহক মহিলার বিয়ে হলে ঐ মহিলার চার সন্তানের মধ্যে দুইজন স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন কন্যা (এদের মধ্যে এক কন্যা বর্ণান্ধতার বাহক), একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন পুত্র এবং একজন বর্ণান্ধ পুত্র জন্ম লাভ করবে।

$F_1$ ফিনোটাইপঃ স্বাভাবিক পুরুষ × বর্ণান্ধ বাহক মহিলা

$F_1$ জিনোটাইপঃ $X^+Y$ $X^+X^c$

গ্যামিটঃ $X^+$ Y $X^+$ $X^c$

$F_2$ জনুঃ

| স্ত্রীগ্যামিট ↓ / পুংগ্যামিট → | $X^+$ | Y |
|---|---|---|
| $X^+$ | $X^+ X^+$<br>স্বাভাবিক কন্যা | $X^+ Y$<br>স্বাভাবিক পুত্র |
| $X^c$ | $X^+ X^c$<br>বর্ণান্ধ বাহক কন্যা | $X^c Y$<br>বর্ণান্ধ পুত্র |

**হিমোফিলিয়া (Haemophilia or Bleeder's Disease)-** হিমোফিলিয়া হলো বংশগতভাবে সঞ্চারণশীল বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এক প্রকার রক্ত তঞ্চন ঘটিত অস্বাভাবিকতা। আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত তঞ্চন হয় না এবং ক্ষরণজনিত কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুও হতে পারে। মানুষের সেক্স (X) ক্রোমোসোমে অবস্থিত হিমোফিলিয়া রোগের প্রচ্ছন্ন জিনটি স্বাভাবিক অ্যালিল ক্ষতস্থানে রক্ত তঞ্চনের জন্য দায়ী। প্রাচীনকাল হতে অনেক পরিবারের পেডিগ্রি পরীক্ষা কেরে দেখা গেছে যে, এ প্রচ্ছন্ন জিনটি বংশ পরম্পরায় পিতা হতে কন্যার মাধ্যমে পৌত্রকে (grandson) আক্রান্ত করে। হিমোফিলিয়ার জিনটি পিতার ক্রোমোসোমে থাকে বলে তা শুধুমাত্র তার কন্যারা পেতে পারে। পুত্র সন্তানগণ পিতা কোন X ক্রোমোসোম পায় না বলে তাদের পক্ষে পিতা হতে এই জিন লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ জিন বহনকারী মাতা হতে এই জিন সে লাভ করতে পারে। এ কারণেই হিমোফিলিয়া আক্রান্ত পিতা হতে শুধুমাত্র কন্যার মাধ্যমে তার পৌত্রগণ তা লাভ করতে সক্ষম এবং কোনক্রমেই পিতা হতে পুত্রগণ এ জিন প্রাপ্ত হয় না। ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কোন পূর্ব পুরুষে হিমোফিলিয়ার জিনটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। অনুমান করা হয় যে, মিউটেশন এর ফলেই তা সর্বপ্রথম মহারাণী ভিক্টোরিয়া (১৮১৯-১৯০১) লাভ করেন। ভিক্টোরিয়ার ৯ সন্তানদের মধ্যে পুত্র লিওপোল্ড এবং ২ কন্যা-অ্যালিস এবং বিয়াট্রিস বাহক ছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া থেকে এ মৃত্যুদূতবাহী জিনটি বিয়ের মাধ্যমে ইউরোপের রাজ পরিবারগুলোর (Royal family) মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। X ক্রোমোসোমে অবস্থিত স্বাভাবিক এবং হিমোফিলিয়া অ্যালিল দুইটি যথাক্রমে $X^H$ ও $X^h$। মহিলারা তিন প্রকার জিনোটাইপবিশিষ্ট হতে পারে। যথা- সম্পূর্ণ স্বাভাবিক-$X^HX^H$, স্বাভাবিক কিন্তু বাহক- $X^HX^h$ ও হিমোফিলিয়া আক্রান্ত-$X^hX^h$। পুরুষদের ক্ষেত্রে দুই ধরনের জিনোটাইপ হতে পারে। যথা- স্বাভাবিক-$X^HY$ ও হিমোফিলিয়া আক্রান্ত-$X^hY$। স্বাভাবিক বাহক মহিলা এবং স্বাভাবিক পুরুষের বিয়ের ফলাফল নিম্নে দেখানো হলো-

পিতা-মাতাঃ স্বাভাবিক পুরুষ × স্বাভাবিক বাহক মহিলা

জিনোটাইপঃ $X^HY$ $X^HX^h$

গ্যামিটঃ $X^H$ Y $X^H$ $X^h$

$F_1$ জনুঃ

| স্ত্রীগ্যামিট ↓ / পুংগ্যামিট → | $X^H$ | Y |
|---|---|---|
| $X^H$ | $X^HX^H$<br>স্বাভাবিক কন্যা | $X^HY$<br>স্বাভাবিক পুত্র |
| $X^h$ | $X^HX^h$<br>স্বাভাবিক কিন্তু বাহক কন্যা | $X^hY$<br>হিমোফিলিক পুত্র |

**স্ত্রীলোকের মধ্যে হিমোফিলিয়া-** স্ত্রীলোকেরা হিমোফিলিয়া রোগে আক্রান্ত হয়না বললেই চলে। কারণ, একটি হোমোজাইগাস কন্যা সন্তান জন্মাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। এ ছাড়া একটি হোমোজাইগাস হিমোফিলিয়াকে কন্যা সন্তান সাধারণত জীবনের প্রথম ঋতুস্রাবের সময় (menstruation) রক্তপাতের ফলে মৃত্যুবরণ করে।

**হিমোফিলিয়ার প্রকারভেদ এবং কারণ-** প্রধানত দুই ধরনের হিমোফিলিয়া দেখা যায়। যথা- হিমোফিলিয়া A এবং B। রক্ত তঞ্চনের (blood clotting) জন্য ফিব্রিনোজেন, প্রোথ্রোম্বিন, $Ca^{2+}$ ইত্যাদিসহ ফ্যাক্টর iii এবং ফ্যাক্টর ix এবং আরো অনেক ফ্যাক্টর প্রয়োজন। হিমোফিলিয়া আক্রান্তরা ফ্যাক্টর viii এবং ফ্যাক্টর ix তৈরি করতে পারে না। হিমোফিলিয়া A এর ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর viii এবং হিমোফিলিয়া B (একে খ্রিস্টমাস রোগও বলা হয়) এর ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর ix এর অভাব দেখা যায়। ফলে রক্ত তঞ্চন ঘটে না। আর তাই হিমোফিলিয়াকদের দেহের কোন স্থান কেঁটে গেলে, এমনকি স্বাভাবিক কাজ কর্ম সম্পাদনকালেও

অভ্যন্তরীণ রক্তপাত (bleeding) ঘটতে পারে। বিশেষ করে, হালকা ব্যায়ামকালে অস্থিসন্ধিতে রক্তপাত একটি সমস্যা। দুই ধরনের হিমোফিলিয়ার মধ্যে হিমোফিলিয়া Aই বেশি এবং আক্রান্তরা ইনজেকসন দ্বারা নিয়মিতভাবে ফ্যাক্টর viii গ্রহণের মাধ্যমে সুস্থ এবং সক্রিয় জীবন যাপন করতে পারে। রক্ত তঞ্চনের ফ্যাক্টর viii এবং ফ্যাক্টর ix সৃষ্টিকারী জিন X ক্রোমোসোমে অবস্থান করে। যেকোনো একটি ফ্যাক্টরের জন্য দায়ী জিনের মিউটেসন ঘটলে ফ্যাক্টরগুলো তৈরি হতে পারে না। তখনই হিমোফিলিয়া দেখা দেয়।

**ডুশিনী মাসকুলার ডিসট্রোফি (Duchene Muscular Dystrophy, DMD)-** ডুশিনী মাসকুলার ডিসট্রোফি শিশুদের একটি বিয়োগান্তক ক্রমশঃ ক্ষয়ে যাওয়া রোগ (tragic wasting discase)। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছেলেরা এতে আক্রান্ত হয়। শৈশব থেকেই আক্রান্ত শিশুর শারীরিক কর্মকাণ্ডে সমস্যা সৃষ্টি হয়। ফাইব্রাস টিস্যু দ্বারা পেশি প্রতিস্থাপিত হওয়ার কারণে পা এবং ঘাড়ের পেশি শক্ত হয়ে যায় এবং অগ্রগতিশীল দুর্বলতা প্রকাশিত হয় (progressive weakness develops)। সাধারণত ১০ বছর বয়সেই একটি শিশুর সঙ্গী হয়ে যায় দুইটি চেয়ার এবং পেশি ক্ষয় বহাল থাকার কারণে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি ২০ বছরের অধিক কমই বাঁচে।

**DMD এর জিনটি সেক্স লিঙ্কড প্রচ্ছন্ন জিন** (sex linked recessive gene) এবং X ক্রোমোসোমে পাওয়া যায়। এই জিনটিও আড়াআড়িভাবে অর্থাৎ পিতা থেকে কন্যা ও কন্যা থেকে নাতীর মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

মনে করা হয়, DMD এর জন্য অ্যালিলটি একটি এনজাইম তৈরি করে যা ফাইব্রাস টিস্যু দ্বারা পেশির প্রতিস্থাপন ঘটায়। প্রতি ৪০০০ ছেলে শিশুর মধ্যে ১জন DMD দ্বারা আক্রান্ত হয়। এদের প্রায় এক তৃতীয়াংশ জিনের স্বতস্ফূর্ত (spontaneous) মিউটেসনের ফলশ্রুতি। এই সকল ক্ষেত্রে আক্রান্ত শিশুর মা জিনটির বাহকও নন। DMD সম্পর্কে রিসার্চ বাহক শনাক্তকরণসহ প্রিন্যাটাল ডায়াগনোসিসে সীমাবদ্ধ। জিন থেরাপী দ্বারাও এর সমাধান থাকতে পারে।

**ABO রক্ত গ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা**

**ABO রক্ত গ্রুপ-** অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ফ্রান্সে এবং পরে ইংল্যান্ডে মানুষ থেকে মানুষে রক্তদান প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার রক্তের মধ্যে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে গ্রহীতা অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হতো মানবদেহের বাইরে দাতা ও গ্রহিতার রক্ত মিশ্রিত করে দেখা গেছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ের রক্ত স্বাভাবিক ভাবে না মিশে কণিকাগুলো পরস্পর জড়িয়ে (coagulate) যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দাতা গ্রহিতা উভয়ের রক্ত স্বাভাবিকভাবে মিশে যায়।

অস্ট্রিয়ার বিজ্ঞানী প্যাথোলজিস্ট ড. কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার (১৯০০ খ্রিস্টাব্দে) এর গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের রক্তের লোহিত কণিকার প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরের দিকে দুই প্রকারের অ্যাগ্লুটিনোজেন (agglutinogen) পাওয়া যায়। এদের অ্যাগ্লুটিনোজেন বা অ্যান্টিজেন A এবং অ্যাগ্লুটিনোজেন বা অ্যান্টিজেন B বলে।

একই সাথে প্লাজমায় দুই প্রকারের অ্যাগ্লুটিনিন (agglutinin) পাওয়া যায়। এদেরকে অ্যাগ্লুটিনিন বা অ্যান্টিবডি a এবং অ্যাগ্লুটিনিন বা অ্যান্টিবডি b বলে। প্রতিটি অ্যান্টিবডি শুধু নির্দিষ্ট এন্টিজেনের সাথে বিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম। অর্থাৎ অ্যান্টিবডি a শুধু অ্যান্টিজেন A এর সাথে এবং অ্যান্টিবডি b শুধু অ্যান্টিজেন B এর সাথে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম। রক্তে এই অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানুষের রক্তকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা যায়। এ ধরনের রক্ত গ্রুপ **ABO রক্ত গ্রুপ নামে পরিচিত।** লোহিত রক্তকণিকায় অ্যান্টিজেন A থাকলে রক্তকে A গ্রুপ, অ্যান্টিজেন B থাকলে B গ্রুপ, অ্যান্টিজেন A ও B উভয়ে উপস্থিত থাকলে AB গ্রুপের প্লাজমায় উক্ত গ্রুপের রক্তকণিকা অ্যাগ্লুটিনেট (agglutinate = জট পাকিয়ে দেয়) করার জন্য কোন অ্যান্টিবডি নেই অর্থাৎ অ্যান্টিবডি a নেই; তবে অ্যান্টিবডি b থাকে যা B গ্রুপের কণিকাগুলোকে অ্যাগ্লুটিনেট করে দেয়। অনুরূপভাবে B গ্রুপের প্লাজমায় উক্ত গ্রুপের কণিকাকে অ্যাগ্লুটিনেট করতে সক্ষম অ্যান্টিবডি b নেই তবে অ্যান্টিবডি a আছে যা A গ্রুপের কণিকাগুলোকে অ্যাগ্লুটিনেট করে দেয়।

ক্রোমোসোমের একই লোকাসে অবস্থিত তিনটি অ্যালিলিক জিন দ্বারা মানুষের রক্তগ্রুপ নিয়ন্ত্রিত। পরস্পর অ্যালিল এই জিনগুলো যেকোনো দুইটি একই সময়ে এক জন মানুষে একজোড়া হোমোলোগাস ক্রোমোসোমের একই লোকাসে উপস্থিত থাকতে পারে। জিনত্রয়কে IA, IB এবং IO সংকেত (symbol) দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে IA ও IB কোডমিন্যান্ট ও IO জিনটি IA ও IB জিনের প্রচ্ছন্ন অ্যালিল হিসেবে আচরণ করে। তবে IA ও IB জিন দুইটি একই সময়ে উপস্থিত থাকলে উভয়ের বৈশিষ্ট্য সমভাবে প্রকাশ পায় অর্থাৎ একটি অন্যটির উপর প্রকট নয়-কোডমিন্যান্ট (codominant)।

**ABO রক্তগ্রুপের বৈশিষ্ট্য**

| রক্ত গ্রুপের নাম | জিনোটাইপ | অ্যান্টিজেন | অ্যান্টিবডি | যাদেরকে রক্ত দান করতে পারে | যাদের রক্ত গ্রহণ করতে পারে |
|---|---|---|---|---|---|
| রক্ত গ্রুপ A | IAIA, IAIO | A | b | A ও AB | A ও O |
| রক্ত গ্রুপ B | IBIB, IBIO | B | a | B ও AB | B ও O |
| রক্ত গ্রুপ AB | IAIB | A ও B | a বা b উভয়ে অনুপস্থিত | AB | A, B, AB, O |
| রক্ত গ্রুপ O | IOIO | অ্যান্টিজেন অনুপস্থিত | a ও b উভয়ে উপস্থিত | A, B, AB, O | O |

**রেসাস রক্ত গ্রুপ বা Rh রক্ত গ্রুপ (Rh or Rhesus Blood Group)-** রেসাস বানরের রক্ত নিয়ে গবেষণাকালে ল্যান্ডস্টেইনার এবং এম.এম ওয়াইনার ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে একটি অ্যান্টিজেন আবিষ্কার করেন এবং রেসাস বানরের (*Macaca mulatta*) নামানুসারে এই অ্যান্টিজেনকে রেসাস অ্যান্টিজেন বা ফ্যাক্টর বা সংক্ষেপে Rh ফ্যাক্টর নামে অভিহিত করেন। রেসাস বানরের রক্ত গিনিপিগের দেহে প্রবেশ করালে Rh এন্টিজেনের প্রভাবে যে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয় তা যে কোন রেসাস বানরের রক্তের লোহিত কণিকাগুলোকে জট বাঁধিয়ে দেয়। এই অ্যান্টিবডি সমৃদ্ধ গিনিপিগের সেরামের সাথে মানুষের লোহিত কণিকা মিশ্রিত করলে কোন কোন ব্যক্তির কণিকাগুলো জট বেঁধে যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন মানুষের লোহিত কণিকায় রেসাস বানরের অনুরূপ Rh অ্যান্টিজেন বর্তমান।

Rh এন্টিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বিবেচনা করে মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথাক্রমে Rh পজিটিভ ($Rh^+$) ও Rh নেগেটিভ ($Rh^-$)।

**Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা**

**১। রক্ত সঞ্চালনের জটিলতা-** কোন মানুষের দেহে স্বাভাবিক ভাবে Rh অ্যান্টিবডি থাকে না, তবে একজন Rh পজিটিভ ব্যক্তির রক্ত কোন কারণে Rh নিগেটিভ মানুষের দেহে প্রবেশ করলে এই অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়। দাতা ও গ্রহিতার মধ্যে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এই অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ, সড়ক দূর্ঘটনায় আহত অবস্থায় একজন Rh নেগেটিভ ব্যক্তিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ABO গ্রুপের Rh পজিটিভ ব্যক্তির রক্ত প্রদান করা হলো। যদি আহত ব্যক্তি ইতিপূর্বে আর কোনদিন Rh পজিটিভ রক্ত গ্রহণ না করে থাকে তাহলে ভয়ের কারণ নেই। কেননা, তার দেহে Rh অ্যান্টিবডি অনুপস্থিত। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তিকে পরবর্তীকালে পুনরায় Rh পজিটিভ দাতার রক্ত গ্রহণ করতে হয় তাহলে তার দেহে দাতার রক্ত কণিকাগুলো জট বেঁধে যাবে। কারণ, প্রথম বার রক্ত গ্রহণের ফলে গ্রহীতার দেহে Rh অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়েছিল। ফলে রক্ত গ্রহীতার মৃত্যু ঘটতে পারে। এরূপ মারাত্মক পরিণতি এড়াবার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কোন Rh নেগেটিভ ব্যক্তি Rh পজিটিভ দাতার রক্ত প্রদান করা উচিত নয়।

**২। গর্ভধারণজনিত জটিলতা-এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস-** শিশু জন্মের ক্ষেত্রে Rh ফ্যাক্টর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জীবনে কোনোদিন $Rh^+$ রক্ত গ্রহণ না করলেও একজন $Rh^-$ মহিলা যদি $Rh^+$ পুরুষকে বিয়ে করে এবং $Rh^+$ সন্তান গর্ভে ধারণ করে তবে ঐ মহিলার দেহে Rh অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারে। তবে প্রথম বার গর্ভধারণ কালে Rh অ্যান্টিবডি যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত না হওয়ায় শিশুর কোন ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু পরবর্তী Rh সন্তান ধারণকালে ইতিপূর্বে মায়ের প্লাজমায় উৎপাদিত Rh অ্যান্টিবডি প্লাসেন্টার মাধ্যমে ভ্রূণের দেহে প্রবেশ করে লোহিত কণিকাগুলোকে নষ্ট করে দেয় যার প্রকোপ সাধারণ গর্ভাবস্থায় শেষ পর্যায়ে অধিক। লোহিত কণিকার ভাঙ্গন বা হিমোলাইসিসজনিত এ রক্তাল্পতার রোগকে এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস নামে অভিহিত করা হয়। এর ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত কণিকাগুলো যার যকৃতের রক্তবাহিকা অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং রক্তে প্রচুর পরিমাণে পিত্ত প্রবেশ করে জন্ডিস অবস্থার সৃষ্টি করে। একজন $Rh^-$ মহিলা প্রথমবার গর্ভধারণের পূর্বে $Rh^+$ রক্ত গ্রহণ করে থাকলে এবং $Rh^+$ সন্তান গর্ভে ধারণ করলে প্রথম সন্তান সমভাবে এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

চিত্র **১১.৬.১** ঃ $Rh^+$ পুরুষ এবং $Rh^-$ মহিলার বিবাহের ফলে সন্তান-সন্ততির Rh গ্রুপ।

**রেসাস ফ্যাক্টরজনিত জটিলতা প্রতিরোধের উপায়-** চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বর্তমানে এন্টি D নামে এন্টিরেসাস অ্যান্টিবডি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই এন্টি D অ্যান্টিবডি রেসাস নেগেটিভ মাতার দেহে সন্তান জন্মের ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকসনের মাধ্যমে প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসা করা যায়।

| **শিক্ষার্থীর কাজ** | বর্ণান্ধ পুরুষ ($X^cY$) ও স্বাভাবিক নারী ($X^+X^+$) এর মধ্যে ক্রসের মাধ্যমে ২য় বংশধরে বর্ণান্ধ বাহক কন্যার জিনোটাইপ নিচের ছকে লিখুন। |
|---|---|
| | |

**সারসংক্ষেপ**

কোণ কোষ তিন ধরনের যাদের প্রত্যেকটি ধরন একেক বিশেষ রঙের প্রতি সংবেদনশীল। যেমন- লাল, সবুজ ও বেগুনি। কোণ কোষগুলো না থাকলে লাল ও সবুজ বর্ণ পৃথকভাবে চেনা যায় না। একটি জিনের প্রচ্ছন্ন অ্যালিল বর্ণ সংবেদী কোষ গঠন ব্যাহত করে। ফলে লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা রোগের সৃষ্টি হয়। হিমোফিলিয়া হলো বংশগতভাবে সঞ্চারণশীল বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এক প্রকার রক্ত তঞ্চনঘটিত অস্বাভাবিকতা। আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত তঞ্চন হয় না এবং ক্ষরণজনিত কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুও হতে পারে। মানুষের সেক্স (X) ক্রোমোসোমে অবস্থিত হিমোফিলিয়া রোগের প্রচ্ছন্ন জিনটি স্বাভাবিক অ্যালিল ক্ষতস্থানে রক্ত তঞ্চনের জন্য দায়ী। প্রধানত দুই ধরনের হিমোফিলিয়া দেখা যায়। যথা- হিমোফিলিয়া A এবং B। ডুশিনী মাসকুলার ডিসট্রোফি শিশুদের একটি বিয়োগান্তক ক্রমশ ক্ষয়ে যাওয়া রোগ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছেলেরা এতে আক্রান্ত হয়। DMD এর **জিনটি সেক্স লিঙ্কড প্রচ্ছন্ন জিন** এবং X ক্রোমোসোমে পাওয়া যায়। ক্রোমোসোমের একই লোকাসে অবস্থিত তিনটি অ্যালিলিক জিন দ্বারা মানুষের রক্তগ্রুপ নিয়ন্ত্রিত। Rh এন্টিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বিবেচনা করে মানুষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথাক্রমে Rh পজিটিভ ($Rh^+$) ও Rh নেগেটিভ ($Rh^-$)। কোন মানুষের দেহে স্বাভাবিক ভাবে Rh অ্যান্টিবডি থাকে না, তবে একজন Rh পজিটিভ ব্যক্তির রক্ত কোন কারণে Rh নেগেটিভ মানুষের দেহে প্রবেশ করলে এ অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়। দাতা ও গ্রহিতার মধ্যে আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এই অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৬

**বহু নির্বাচনি প্রশ্ন**

১। লাবনি বর্ণান্ধ ($X^bX^b$)। তার পিতা-মাতার জিনোটাইপ হবে?

ক. XY ও $X^bX$ খ. XY ও $X^bX^b$

গ. $X^bY$ ও $X^bX^b$ ঘ. $X^bY$ ও XX

২। রক্ত তঞ্চনের জন্য ফ্যাক্টর-

i. ফিব্রিনোজেন

ii. প্রোথ্রোম্বিন

iii. ফ্যাক্টর ix

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। রুমি একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছেন। জন্মের পর কন্যাটি অসুস্থ হয়। পরে ডাক্তারের পরামর্শক্রমে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষায় লোহিত কণিকার ভাঙ্গনের ফলে রক্তাল্পতার বিষয়টি ধরা পড়ে। রুমির সমস্যার ক্ষেত্রে কোন ফ্যাক্টরটি গুরুত্বপূর্ণ?

ক. Rh খ. প্রোথ্রোম্বিন

গ. ফ্যাক্টর ix ঘ. ফিব্রিনোজেন

## পাঠ-১১.৭ সমালোচনাসহ বিবর্তনের মতবাদসমূহ

**উদ্দেশ্য**

**এই পাঠ শেষে আপনি–**

- বিবর্তন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বিবর্তনের মতবাদসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিবর্তনবাদের সমালোচনাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিবর্তনের প্রমাণসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।

| | |
|---|---|
| **প্রধান শব্দ** | বিবর্তন, ল্যামার্কিজম, ডারউইনিজম, নব্য-ডারউইনিজম |

**বিবর্তন (Evolution)-** বিবর্তনের অপর নাম অভিব্যক্তি। বিবর্তন বলতে সাধারণভাবে বুঝায় কোনো কিছু বিকশিত হওয়া, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হওয়া। বিশাল পৃথিবীর বুকে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের যে সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর সমারোহ দেখা যায় তারা ইতিপূর্বে বিদ্যমান সরল প্রকৃতির জীব থেকে ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে- এ ধারণাকে জৈব বিবর্তন বাদ (the theory of organic evolution) বলে।

আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণা অনুযায়ী প্রায় ৪৫০ কোটি বৎসর পূর্বে সূর্যের বিচ্ছিন্ন অংশ হতে পৃথিবীর উদ্ভব ঘটে। উৎপত্তির প্রথম অবস্থায় এটি একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড বিশেষ ছিল এবং তাপ বিকিরণের ফলে ধীরে ধীরে শীতল হয় এবং জলীয় বাষ্প হতে ঘন মেঘের সৃষ্টি হয়। মেঘ হতে বৃষ্টিপাতের ফলে কালক্রমে জলভাগগুলোর সৃষ্টি হয়। মেঘাচ্ছন্ন এই অবস্থায় হঠাৎ সূর্যের আলো পেয়ে পানিতে বিদ্যমান অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক উপাদান সংমিশ্রিত হয়ে আকস্মিকভাবে প্রোটোপ্লাজমের উদ্ভব হয়। আবহাওয়ার পরিবর্তনের পরবর্তী বছরে পরিবেশের আরও পরিবর্তনের ফলে কালক্রমে এই প্রোটোপ্লাজম হতে প্রথমে এককোষী উদ্ভিদ ও পরে কতকগুলো উদ্ভিদের দেহ হতে মিউটেশন (mutation) এর ফলে ক্লোরোফিল বিনষ্ট হয়ে প্রাণীর উদ্ভব হয়। ক্রমান্বয়ে এককোষী উদ্ভিদ ও প্রাণী বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণীতে পরিণত হয় এবং এদের ক্রমবিকাশের ফলে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ ও প্রাণীর উদ্ভব হয়।

পূর্ব থেকে বিদ্যমান এমন একটি সরল জীব পরিবেশের সাথে অনুকূলতা রক্ষাকল্পে ধীরগতিতে সার্বক্ষণিকভাবে দৈহিক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে নতুন জীবে রূপান্তরিত হওয়াকে জৈব বিবর্তন (organic evolution) বলে।

**বিবর্তন এর মতবাদসমূহ (The theories of evolution)-** বিবর্তন ঘটছে- এটি প্রমাণ করা সম্ভব হইলেও, কিভাবে ঘটছে এই ব্যাপারে মতভেদ আছে। বিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পর্কিত বিবর্তনবিদগণের ব্যাখ্যাসমূহকেই বিবর্তনের মতবাদ (the theories of organic evolution) বলে। বিবর্তনের মতবাদগুলোর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো- ১. ল্যামার্কিজম, ২. ডারউইনিজম ও ৩. নব্য ডারউইনিজম।

**১. ল্যামার্কিজম (Lamarckism)-** ফরাসী প্রকৃতি বিজ্ঞানী Jcan Baptist Lamarck (১৭৪৪-১৮২৯), ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে ফিলোসফিক জুলজিক (Philosophic Zoologique) গ্রন্থে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশগতি (theory of inheritance of acquired character) নামক বিবর্তন সম্পর্কীত মতবাদ প্রকাশ করেন।

ল্যামার্কের মতবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, পরিবেশের প্রভাবের ফলেই বিবর্তন সংঘটিত হতে পারে। পরিবেশের প্রভাবে জীবের দৈহিক গঠনের পরিবর্তন হয়। তাঁর মতে বিবর্তন কতিপয় রীতি-নীতি মেনে চলে। এই রীতি-নীতিগুলোই বিবর্তনের ক্রম ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। ল্যামার্ক তাঁর বিবর্তন তত্ত্বেও এ রীতি-নীতিগুলোই ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মধ্যে Dodson, 1960 ল্যামার্কের একজন বিশিষ্ট সমর্থক। Dodson ল্যামার্কবাদকে চারটি সূত্রে ব্যাখ্যা করেছেন যা ল্যামার্কীয় সুত্র বলেও পরিচিত।

সূত্র ১ঃ জীবদেহ এবং দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আকারে ক্রমবর্ধিত হওয়ার একটি লক্ষণ সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়।

সূত্র ২ঃ জীবন ধারণের প্রয়োজনে কোন নতুন চাহিদা এবং এ চাহিদার ফলে জীবন অভ্যাসের যে পরিবর্তন হয় তার ফলেই নতুন প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি হয়।

সূত্র ৩ ঃ কোন একটি অঙ্গ প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত হলে তা উন্নত এবং সুগঠিত হয়, কিন্তু ব্যবহৃত না হলে ক্রমান্বয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে অবশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ সুত্রটি ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র নামে পরিচিত।

সূত্র ৪ঃ কোন একটি জীবের দেহে উন্নতি বা ক্ষয়প্রাপ্তির মাধ্যমে যে সকল পরিবর্তন সাধিত হয় তা অর্জিত বৈশিষ্ট্যরূপে অঙ্গীভূত হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মে (Generation) সঞ্চারিত ও বিকশিত হয়। এ সূত্রটি অর্জিত বৈশিষ্ট্য সঞ্চারণের সূত্র (Law of inhertance of acquired character) নামে অভিহিত।

ডডসন আলোচিত ল্যামার্কবাদের বস্তসংক্ষেপ এ যে, কোনো জীবের দেহে পরিবেশের প্রভাবে বা প্রাকৃতিক অভিঘাতের ফলে যে রূপান্তর সংঘটিত হয় তাহা প্রজন্ম হতে প্রজন্ম বংশানুক্রমে সঞ্চারিত ও বিকশিত হয়ে নতুন প্রত্যঙ্গে পরিণত হয়। বিভিন্ন আলোচনা ও সমালোচনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ল্যামার্কের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রে কিছুটা সত্য নিহিত আছে। উদাহরণস্বরূপ, অব্যবহারজনিত বিলুপ্তির উদাহরণ পাওয়া যায় সাপের উপাঙ্গে যা গর্তে প্রবেশের সময় ভূমির সাথে ঘর্ষণ এবং দীর্ঘ দিনের অব্যবহারের ফলে কালক্রমে বিলুপ্ত হয়েছে। উট পাখির পূর্ব পুরুষেরা উড়তে পারতো কিন্তু বংশাণুক্রমে দীর্ঘদিন ডানা ব্যবহার না করার ফলে তা নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হয়েছে।

প্রতিনিয়ত ব্যবহারের ফলে অঙ্গ উন্নত ও সুগঠিত হয়। যেমন- কর্মকার, ব্যায়ামবিদ, দৌড়বিদ প্রভৃতি মানুষের পেশি খুব সুগঠিত। ল্যামার্ক মনে করেন যে, প্রাচীনকালে জিরাফের সামনের পা ও গ্রীবা লম্বা ছিল না। পরবর্তী কালে ব্যবহারিক প্রয়োজনে জিরাফের পা ও গ্রীবা প্রলম্বিত হয়েছে। স্থলভাগে চারণযোগ্য ভূমির অভাব অনুভূত হওয়ায় জিরাফের হরিণাকৃতি পূর্ব পুরুষেরা গাছের পাতা ভক্ষণ করতে আরম্ভ করে। এর জন্য তাদের সামনের পায়ে ভর দিতে এবং গ্রীবা উত্তোলন করতে হতো। ক্রমান্বয়ে বৃক্ষ শীর্ষস্থিত পাতাগুলো ভক্ষণের জন্য অগ্র পায়ের অধিক ব্যবহার এবং গ্রীবা উত্তোলন ও প্রসারণের ফলে বংশানুক্রমে প্রলম্বিত হতে হতে এরা বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

**২. ডারউইনিজম (Darwinism)-** ইংরেজ প্রকৃতিবিদ চার্লস রবার্ট ডরইউন (১৮০৯-১৮২২) ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবী প্রদক্ষিণরত HMS Beagle জাহাজে প্রকৃতিবিদের অবৈতনিক চাকরি নিয়ে কেপ, ডান্ডি, আটলান্টিক দ্বীপপুঞ্জ, তাহিতি, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া মালদ্বীপ, মরিসাস, সেন্ট হেলেনা, ব্রাজিল, গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পাঁচ বছর (২৭ ডিসেম্বর ১৮৩১ থেকে ২ অক্টোবর ১৮৩৬) কালব্যাপী ভ্রমণ শেষে জৈব বিবর্তন এবং প্রাণীসমূহের ভেতর সাদৃশ্য ও সম্পর্ক বিষয়ে বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করেন। পরবর্তী প্রায় ১৫ বছর তিনি এসব উপাত্ত নিয়ে গবেষণা করেন। এ সময়েই ম্যালথাস এর জনসংখ্যা সম্পর্কীত প্রবন্ধ পাঠ করে প্রাকৃতিক সংঘাত কিভাবে প্রাণীসমূহের স্থায়িত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে তিনি সে সম্বন্ধে অবহিত হন। এরই এক পর্যায়ে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (১৮২৩-১৯১৩) ডারইউন এর সাথে অভিন্ন মত প্রকাশ করেন। অতঃপর জিওলজিস্ট লায়েল ও উদ্ভিদবিদ হুকার বন্ধুদ্বয়ের পরামর্শ অনুযায়ী ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ১লা জুলাই প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা প্রজাতির উৎপত্তি নামক মতবাদটি লন্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির সভায় প্রকাশ করেন।

ডারউইনের তত্ত্ব বা ডারউইন ওয়ালেস তত্ত্ব প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব নামে পরিচিত। জুলিয়ান হাক্সলে এর মতে এই তত্ত্ব তিনটি পর্যবেক্ষণ ও দুইটি সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। ওয়ালেস এর ব্যাখ্যানুসারে এ তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তগুলো নিম্নরূপ-

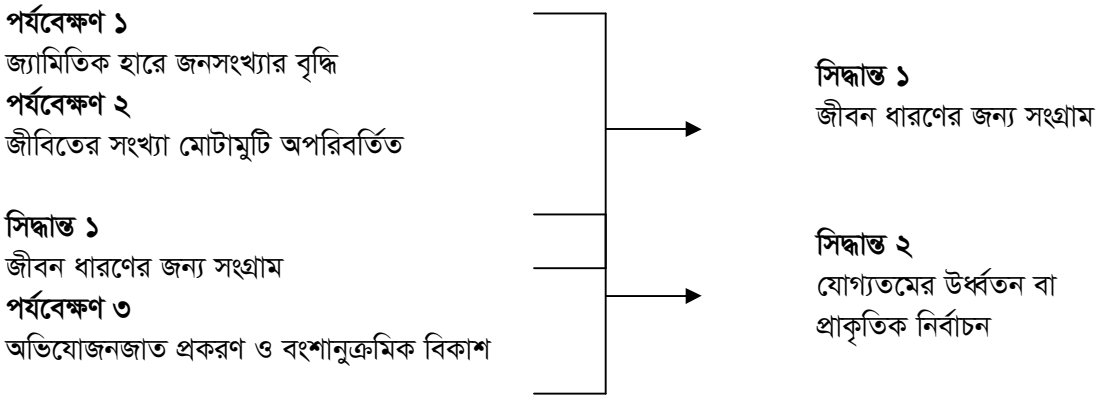

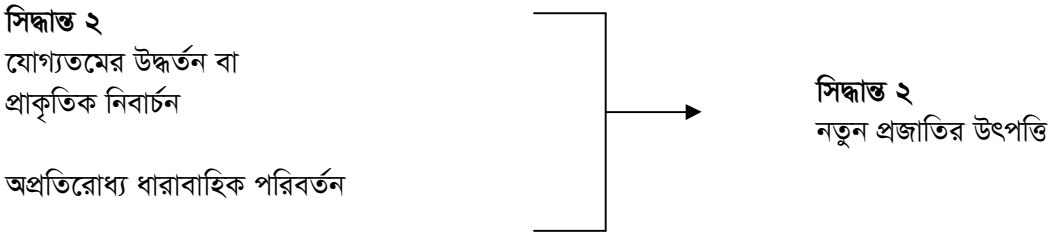


**ডারউইন-ওয়ালেস তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো** নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

**১। অত্যধিক বংশ বৃদ্ধির হার (Prodigality of production)-** প্রত্যেক জীবে জ্যামিতিক হারে বংশ বৃদ্ধির একটা প্রবণতা দেখা যায়। এককোষী জীব প্যারামেসিয়াম বছরে প্রায় ৬০০ বার জনন কার্য সম্পন্ন করে। এই ক্ষুদ্র প্যারামেসিয়াম এর সকল বংশধর বেঁচে থাকলে পৃথিবী ভরে যেত। ডারউইন হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, প্রতি জোড়া হাতি দম্পতি যারা ৯০ বৎসরের জীবনকালে একটি করে মাত্র ৬ বার বাচ্চা দেয়, যদি সবগুলো বাচ্চা বেঁচে থাকতো এবং প্রতিটি স্ত্রী শাবক বেঁচে থেকে অনুরূপভাবে বংশ বৃদ্ধি করতো তবে ৭৫০ বছরে প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ হাতি হতো। কিন্তু তা হয়না। প্রজাতির সংখ্যা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।

**২। স্থান ও খাদ্যের সীমাবদ্ধতা (Limitation of Food and Space)-** যে হারে জীব উৎপন্ন হয় সে অনুপাতে পৃথিবীতে স্থান ও খাদ্য নেই। এ অবস্থায় ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত জীব উৎখাত করতে একাধিক প্রভাব বিজড়িত হয়ে পড়ে।

**৩। জীবন ধারণের জন্য সংগ্রাম (Struggle for existence)-** ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি জীব উৎপন্ন হওয়ায় অস্তিত্ব বজায় রাখার নিমিত্তে খাদ্য, স্থান প্রভৃতির জন্য সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে উঠে। এ সংগ্রাম তিন ধরনের। যথা- ক. অন্ত:প্রজাতিক সংগ্রাম (Intraspecific struggle): একই প্রজাতির জীবের মধ্যে খাদ্য, আশ্রয়, প্রজনন, ভূমি ইত্যাদির জন্য সংগ্রামকেই অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম বলে। খ. আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (Interspecific struggle): ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে সংগ্রামকে বুঝায়। এই সংগ্রামে সম্পর্কটি সাধারণত খাদ্য ও খাদকের মধ্যে বিরাজমান। গ. পরিবেশগত সংগ্রাম (Environmental stuggle)- জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরিবেশের সাথে (যেমন- খরা, প্লাবন, শীত, ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি) সংগ্রামকে বুঝায়।

**৪। প্রকরণ (Variation)-** পৃথিবীতে কোন দুইটি জীব হুবহু একরূপ নয়। একই প্রজাতির জীবের মধ্যে, এমনকি একই পিতা-মাতার সন্তান-সন্ততির মধ্যে প্রকরণ বা ভেদ দেখা যায়। প্রজননের মাধ্যমে এই প্রকরণ সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ সংগ্রামের ফলে অভিযোজনজাত প্রকরণ বংশাণুক্রমে পরিচালিত হয়ে অবশেষে জীবের বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ডারউইনের মতে সামান্য ধারাবাহিক প্রকরণই ভিন্ন ভিন্ন জীব উৎপত্তির জন্য দায়ী।

**৫। প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতমের উর্দ্ধতন (Natural Selection or Survival of the Fittest)-** ডারউইনের মতে জীবন ধারণের সংগ্রামে কেবল সেই জীব সাফল্য লাভ করে যাদের দেহে সংগ্রামের পক্ষে অনুকূলে এবং অধিকতর ও সঙ্গত সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিযোজন বা প্রকরণ থাকে। যে সকল জীবের অভিযোজন বা প্রকরণ সংগ্রাম উত্তরণের উপযোগী নহে তারা পৃথিবী হতে বিলীন হয়ে যায়। ডারউইন একে প্রাকৃতিক নির্বাচন (natural selection) বলে অভিহিত করেছেন। Herbert Spencer একে যোগ্যতমের উর্দ্ধতন (survival of the fittest) হিসেবে অ্যাখায়িত করেছেন।

**৬। উত্তরলব্ধি ও নতুন প্রজাতির উৎপত্তি (Inheritance and Origin of New Species)-** সুবিধাজনক প্রকরণসমূহ প্রাকৃতিক নির্বাচনে উর্ত্তীণ হয়ে তারা সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হয়। সন্তান-সন্ততির আরো প্রকরণের ফলে জনু থেকে জনুতে ক্রমান্বয়ে জীবের বৈশিষ্ট্যের রূপান্তর ঘটে। এভাবে অনেক জনুর পর সামান্য প্রকরণগুলো সঞ্চিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে নতুন বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা যায়। ফলে নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

**বিবর্তনের সমালোচনাসমূহ-** একে দুটি ভাগে বর্ণনা করা যায়। যথা- ১। ল্যামার্কিজম মতবাদের সমালোচনা ও ২। ডারউইনিজম মতবাদের সমালোচনা।

**ল্যামার্কিজম মতবাদের সমালোচনা-** ল্যামার্কের সমকালীন অনেকের সাময়িক স্বীকৃতি পেলেও এ মতবাদ বিজ্ঞানী মহলে অনেক কারণে সমর্থনযোগ্য হয়নি। যেমন- ল্যামার্কের ব্যবহার ও অব্যবহার তত্ত্বটি সত্য নয়। কারণ- শিরা ও ধমনি

ক্রমাগত ব্যবহৃত হলেও এদের আকার ও আয়তন কখনোই বৃদ্ধি পায় না, আবার ব্যবহারের ফলে কোনো অঙ্গের বৃদ্ধি হয়তো হতে পারে। কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে কোনো অঙ্গের নিষ্ক্রিয়তা কিংবা অবলুপ্তির ঘটনাও বিরল নয়, অর্জিত গুণের বংশানুক্রম সমর্থনযোগ্য নয়। লেজ কাটা কুকুরের বাচ্চা জন্মসূত্রে কখনোই লেজবিহীন হয় না। অভাব বোধ ও দরকারের তাগিদে অঙ্গ সৃষ্টির ধারণা সমর্থযোগ্য নয়। আকাশে উড়বার আকাঙ্ক্ষায় কোনো মানুষের মনে পাখির ন্যায় ডানার জন্য অভাব বোধ মানুষের দেহে কখনো ডানা গজাবে না। ইন্দ্রিয় সৃষ্টির পূর্বে কোনো ইন্দ্রিয়ের জন্য অভাব অনুভূত হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। ল্যামার্ক ধারণা করতেন ক্রিয়ার ফলেই কোনো অঙ্গের সৃষ্টি হয় কিন্তু অঙ্গ না থাকলে তার ক্রিয়ার প্রশ্ন অবান্তর।

**ডারউইনিজম মতবাদের সমালোচনা-** বিবর্তনের ক্ষেত্রে ডারউইনের মতবাদ নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী সাড়া জাগানো অবদান। বিশ্বব্যাপী সমর্থিত হলেও মতবাদটি সর্বজন স্বীকৃত নয়। কারণ- এ মতবাদে যেমন কতকগুলো যৌক্তিক ও প্রশংসনীয় দিক রয়েছে তেমন কতকগুলো অযৌক্তিক দিকও রয়েছে। নিম্নে যৌক্তিক ও অযৌক্তিক দিকগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

**যৌক্তিক দিক**

- ডারউইন মতবাদের মূল বক্তব্যগুলো অনেকাংশেই বাস্তব ও যৌক্তিক।
- বিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এখন পর্যন্ত যে সকল প্রমাণ পাওয়া গেছে তা ডারউইনবাদের সমার্থক।
- অতীতের অনেক বৃহদাকার জীব জীবন সংগ্রামে ব্যক্ত হয়ে প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়েছে।
- অভিযোজনে ব্যর্থ অনেক প্রাণী ও উদ্ভিদের বিলুপ্তি ডারউইনবাদের পক্ষে কথা বলে।
- প্রকৃতিতে একই প্রজাতির দুটি জীব হুবহু এক রকম নয়। এটি প্রকৃতিতে প্রকরণের উপস্থিতি প্রমাণ দেয়।

**অযৌক্তিক দিক**

- জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমের জয়ের কথা বলা হয়েছে কিন্তু কিভাবে উপযুক্ত প্রকরণের উদ্ভব হয় তা বলা হয়নি।
- জীবজগতের সকল নির্বাচন প্রাকৃতিক নির্বাচন নয়।
- প্রাকৃতিক নির্বাচন কোনো জীবদেহে নিষ্ক্রিয় অঙ্গের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে অপারগ।
- ডারউইন যেকোনো ধরনের প্রকরণ বা পরিবৃত্তিকে বংশগত মনে করতেন। কিন্তু আমরা জানি কেবল জনন কোষের সংগঠিত প্রকরণগুলোই বংশানুসরণযোগ্য।
- একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে যে সামান্য পার্থক্য দেখা যায় তার ভিত্তিতে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম।

**৩. নব্য-ডারউইনবাদ (Neo-Dawinism)**

নব্য-ডারউইনবাদ বস্তুত ডারউইনবাদের আধুনিক রূপরেখা (modern systhesis)। বলা যায় মেন্ডেলিয় জেনেটিক্স এর সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচন এর নতুন সংশ্লেষ, প্রাক-মেন্ডেলিয় যুগে যা ছিল একটি মিশ্র প্রক্রিয়া।

ডারউইন তাঁর বিখ্যাত প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদের নতুন প্রজাতির উৎপত্তি বিষয়ে যে ব্যাখা দেন তা যথেষ্ট মনে হয়নি বরং এ ব্যাখ্যা নিয়ে ডারউইন সমালোচনার মুখে পড়েন। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, প্রাকৃতিক নির্বাচন ক্রিয়াশীল সন্দেহ নেই কিন্তু কিভাবে নতুন বৈশিষ্ট্য বা নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয় ডারউইনবাদে তার উত্তর নেই। এর জন্য অবশ্য ডারউইনকে দায়ী করা যায় না। কারণ, জীবের প্রকরণ (variation) কিভাবে হয় ডারউইন যুগে সে তথ্য জানা ছিল না।

মেন্ডেলিয়ান জেনেটিক্স প্রবর্তনের ফলে জানা যায়, জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যের আকস্মিক বংশাণুসৃতিযোগ্য পরিবর্তন বা পরিব্যক্তি (mutation) ই হলো নতুন প্রজাতি সৃষ্টির কাঁচামাল যা এখন স্বতঃসিদ্ধ বলে পরিগণিত। তাই ডারউইনের এই সমস্যাকে নিয়ে জর্জ রোমানেস (Geogre Romanes) নব্য ডারউইনবাদ নামকরণ করেন। জীবের বংশাণুসৃতিযোগ্য পরিবর্তনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো জীবকোষের মধ্যস্থিত ডিএনএ অণু (DNA molecule)। অবশ্য বেশ আগেই বিজ্ঞানীরা এই ম্যাজিক অণুটির সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যান। জানা যায় যে, DNA হলো বংশগত বৈশিষ্ট্যের মূল আধার। DNA

বংশাণুক্রমে জীবদেহে সঞ্চারিত হতে হতে মাঝে মাঝে ভূল মুদ্রণ (mis-copying) করে ফেলে যার জন্য সৃষ্টি হয় পরিব্যক্তি (mutation) এবং জন্ম নেয় নতুন জিন এবং নতুন প্রজাতি। বস্তুত এটিই হচ্ছে প্রজাতির উৎপত্তি (origin of species) এর ধারণা।

অগাস্ট ভাইজম্যান (August Weismann) এর নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী ডারউনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদকে নতুন মাত্রা দিয়ে নব্য-ডারউইনবাদকে এগিয়ে নেন। নব্য-ডারউইনবাদের মতে যে প্রক্রিয়ায় ক্ষুদ্র পরিবর্তনগুলো (microevolution) ঘটে, সেই একই প্রক্রিয়ায় বৃহৎ পরিবর্তনগুলোও ঘটে। এখানে বলা হয় বিবর্তন একটি দৈব প্রক্রিয়া যা দৈবাৎ ঘটনা। আকস্মিকভাবে DNA - এর এক বা একাধিক নিউক্লিওটাইড এর মধ্যে পরিবর্তন দ্বারা ছোট বা বড় পরিবর্তন (macroevolution) এর সৃষ্টি হয়। বড় পরিবর্তন ঘটে রিকম্বিনেসন বা জেনেটিক সংমিশ্রণের কারণে। এই দুই প্রক্রিয়া মিউটেসন এবং রিকম্বিনেসন এর যুগপৎ সংমিশ্রণের নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয় এবং নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

বিবর্তনের কৌশলগত ব্যাখ্যাকে চূড়ান্ত রূপ দেন হাক্সলে, ফিশার, ডবজানস্কি, রাইট, মায়ার, সিম্পসন ও স্টেবিনস। এদের গবেষণা লব্ধ তত্ত্ব এবং তথ্য বর্তমানে মিশ্র তত্ত্ব (synthetic theory) নামে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নব্য-ডারউইনবাদ মূলত এই তত্ত্বের উত্তরসূরী।

**বিবর্তন এর প্রমাণসমূহ (Evidences of Evolution)-** বিবর্তনের স্বপক্ষে স্বাক্ষ্য বা তথ্য বা প্রমাণ অফুরন্ত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রমাণগুলো হলো- ১। অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ, ২। ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ, ৩। জীবাশ্মগত প্রমাণ, ৪। ভৌগোলিক প্রমাণ, ৫। শারীরবৃত্তীয় প্রমাণ, ৬। শ্রেণিবিন্যাসগত প্রমাণ, ৭। পরীক্ষামূলক প্রমাণ, ৮। জিন তত্ত্বীয় প্রমাণ ও ৯। অভিযোজনঘটিত প্রমাণ। এদের সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্নে আলোচনা করা হলো-

**১। অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ (Morphological evidence)-** জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-তন্ত্র দ্বারা বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণের ব্যাখ্যাদানকে অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ বলে। অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যথা-

**ক. তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ-** দুইটি জীবের মধ্যে অবস্থিত একই ধরনের অঙ্গের পার্থক্যগুলো উল্লেখ করে বিবর্তনের ধারা নির্দেশ করাকে তুলনামূলক অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ বলে। মেরুদণ্ডী প্রাণীকূলে এরূপ অনেক অঙ্গের অবস্থান দেখা যায়। ধরা যাক, মাছ, ব্যাঙ এবং গিনিপিগ তিনটি মেরুদণ্ডী প্রাণী। বিবর্তনবিদদের ধারণা এই তিনটি প্রাণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা আদি এবং বিবর্তন দ্বারা কালের পরিবর্তনে মাছ থেকে ব্যাঙ এবং গিনিপিগ সৃষ্টি হয়েছে। এই বিবর্তনের প্রমাণ এদের কতকগুলো অঙ্গের তুলনামূলক আলোচনা হতে পাওয়া যায়। মাছের হৃৎপিণ্ডে মাত্র দুইটি প্রকোষ্ঠ (১ অরিকল এবং ১ ভেন্ট্রিকল) আছে । এটি বিবর্তনের দ্বারা ব্যাঙে সৃষ্টি করেছে তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হৃৎপিন্ড (২ অরিকল এবং ১ ভেন্টিকল)। এরই বিবর্তনে গিনিপিগি তৈরি হয়েছে চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্টি হৃৎপিন্ড (২ অরিকল এবং ২ ভেন্ট্রিকল)।

**খ. সমসংস্থ ও অসমসংস্থ অঙ্গভিত্তিক প্রমাণ-** উৎপত্তির দিক থেকে একই ধরনের কিন্তু কার্যগতভাবে পৃথক এরূপ অঙ্গকে সমসংস্থ (homologous) অঙ্গ বলে। পাখির ডানা, গরুর অগ্রপদ এবং মানুষের হাত একইভাবে উৎপন্ন হয়েছে। উপাঙ্গগুলোতে হিউমেরাস, রেডিওআলনা বিদ্যমান। কিন্তু কাজের তারতম্যের কারণে এদের বাহ্যিক আকৃতি ভিন্ন হয়েছে। এটি বিবর্তনের জন্যই হয়েছে। এরূপ বিবর্তনকে কেন্দ্রাপসারী (divergent) বিবর্তন বলে।

উৎপত্তিগতভাবে ভিন্ন কিন্তু একই ধরনের কাজ সম্পাদন করে এমন অঙ্গকে অসমসংস্থ অঙ্গ (Analogous organ) বলে। তেলাপোকা ও পাখির ডানা এরূপ দুটি অঙ্গ। অঙ্গদ্বয়ের মধ্যে উৎপত্তিগত কোন সামঞ্জস্য নেই তবে উভয় অঙ্গই একই ধরনের কার্য সম্পাদন করে। এরূপ বিবর্তনকে কেন্দ্রাভিমুখী বিবর্তন (convergent evolution) বলে।

**গ. নিষ্ক্রিয় অঙ্গাবলী দ্বারা প্রমাণ-** আদি প্রাণীতে ছিল অথবা এখনও আছে, কিন্তু তা থেকে উদ্ভূত উন্নত প্রাণীকূলে অলুপ্তির মুখে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ হিসেবে এখনো বিবর্তনের স্বাক্ষী বহন করে এরূপ অঙ্গকে লুপ্তপ্রায় বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ (vestigial organ) বলে। একমাত্র মানব দেহেই প্রায় দুই শতাধিক নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বিদ্যমান। এই অঙ্গগুলো এক সময় আদি প্রাণীতে সক্রিয় ছিল। মানুষের কানের পেশি, অ্যাপেন্ডিক্স, পুচ্ছ-দেশীয় কশেরুকা বা কক্কিক্স এরূপ কয়েকটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ। গিনিপিগ, গরু ইত্যাদি স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এদের সক্রিয় ভূমিকা এখনো দৃষ্ট হয়। গরু এর কান নাড়াতে পারে কিন্তু মানুষ তা পারে না। লেজের কশেরুকাগুলো একত্রিত হয়ে ছোট অস্থি পিণ্ড বা কক্কিক্স হিসেবে মেরুদণ্ডের পশ্চাৎ প্রান্তে এখনো অবস্থান করছে। পরিবেশগত কারণে মানুষে এই সকল অঙ্গাবলী প্রয়োজনে না আসায় বিবর্তন দ্বারা নিষ্ক্রিয় অঙ্গে রূপান্তরিত হইয়াছে।

**২। ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ (Embryological evidence)-** ডিমের পর্দার ভিতরে অথবা মাতৃগর্ভে যতদিন একটি নিষ্ক্রিয় ডিম বৃদ্ধি পায় ততদিন প্রাণীর ঐ অপরিণত অবস্থাকে ভ্রূণ বলে। ভ্রূণের এককোষী বা আদি অবস্থাকে জাইগোট বলে। বহুকোষী প্রথম অবস্থাকে মরুলা, একস্তরী ফাঁপা অবস্থাকে ব্লাস্টুলা এবং দ্বিস্তরী অবস্থাকে গ্যাস্ট্রুলা বলে। বিজ্ঞানী হেকেল (Haekal, 1966) মনে করেন যদি একটি প্রাণী অপর কোন একটি প্রাণী হতে উদ্ভব হয়ে থাকে, তবে উদ্ভূত প্রাণীটি এর ভ্রূণের বিপরিণতিতে আদি প্রাণীর পরিণত অবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো পুনরাবৃত্তি করবে। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়- ব্যক্তিজনি জাতিজনির বৈশিষ্ট্য পুনরাবৃত্তি করে (ontogeny ecapitulates phylogeny)। একে হেকেল এর পুনরাবৃত্তিবাদ (theory of recapitulation of Haeekal) বলে। উদাহরণস্বরূপ, যদি মাছ জাতীয় প্রাণী হতে মানুষের উদ্ভব হয়ে থাকে তবে মানুষের ভ্রূণ অবস্থায় পরিণত মাছের আকৃতি দেখা দিবে। শুধু মানুষই নয়, সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই হইতে উদ্ভব হয়েছে ভ্রূণের পর্যায়গুলো তার সাক্ষ্য বহন করে। সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীতে জাইগোট অর্থাৎ এককোষী প্রাণীর অবস্থা মরুলা বা ভলভক্স অবস্থা , ব্লাস্টুলা বা পরিফেরা পর্বের প্রাণীর অবস্থা, গ্যাস্ট্রুলা বা নিডারিয়া পর্বের প্রাণীর অবস্থা বিদ্যমান। মেরুদণ্ডী প্রাণী নিম্নস্তরের বিভিন্ন পর্বের প্রাণী হতে পর্যায়ক্রমে যদি বিবর্তন দ্বারা উদ্ভূত না হতো তবে এদের ভ্রূণ অবস্থায় কখনোই ঐ পর্যায়গুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটতো না। সকল প্রাণীর ভ্রূণের প্রথম অবস্থা প্রায় একই ধরনের। কিন্তু পরিণত প্রাণীগুলো কেউই কারো সাথে আকৃতিগত সাদৃশ্য বহন করে না। এতেও প্রমাণ হয় যে, ঐ সকল প্রাণী মূলত একই আদি প্রাণী হতে সৃষ্ট। বিবর্তনের জন্য এরা পরবর্তীতে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। ভন-বেয়ার (Von Bare) সর্বপ্রথম ভ্রূণের মধ্যে এই সাদৃশ্য লক্ষ করেন।

**৩। ভৌগোলিক বিস্তারগত প্রমাণ (Evidence from geographical distribution)-** উদ্ভিদ ও প্রাণীর ভৌগোলিক বিস্তার বিবর্তন সংঘটনের সাক্ষ্য বহন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের নানা প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই পরিলক্ষিত হয়। বিবর্তনবিদগণ একে জৈব অভিব্যক্তির প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বিবর্তনবিদগণ মনে করেন যে, পৃথিবীর বর্তমান মহাদেশগুলো প্রথমে একটি একক বা অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড ছিল। পরে সুদীর্ঘকালের নৈসর্গিক পরিবর্তনের মাধ্যমে অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাদেশসমূহের সৃষ্টি করেছে। সম্ভবতঃ প্রথমে পৃথিবীর সর্বত্র একই পরিবেশে উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ অনুরূপ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবর্তনের ফলে বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে বিভিন্ন প্রকার জীব দেখা যায়। ভূতাত্ত্বিক তথ্য নির্দেশ করে যে, এককালে অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আমেরিকার সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় এমন কিছু প্রাণী দেখা যায় যা দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে দেখা যায় না। এর সম্ভাব্য কারণ এই যে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর দুইটি মহাদেশে ভূ-তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের পরিবর্তন হয় এবং অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবের গঠন প্রকৃতিরও রূপান্তর হয়। আবার অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার 'মারসুপিয়াল' বা ক্যাঙ্গারুজাতীয় প্রাণীগুলো মূলতঃ অনুরূপ কিন্তু ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার কারণে এরা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা হয় যে, উভয় মহাদেশের মারসুপিয়ালগুলো একই পূর্ব পুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

**৪। শারীরবৃত্তীয় প্রমাণসমূহ (Physiological evidence)-** বিভিন্ন প্রাণীর রক্ত এবং দানা (blood crystal) পরীক্ষা করে এদের পরস্পর সম্পর্ক নিরূপণ করা যায়। যেমন- মানুষ ও শিম্পাঞ্জীর রক্তে অনুরূপ হিমোগ্লোবিন দানা দেখা যায়। এদের হিমোগ্লোবিন দানাগুলো কুকুর ও অশ্বের হিমোগ্লোবিন দানা থেকে ভিন্ন ধরনের। অগ্ন্যাশয় হতে ট্রিপসিন নামক এক প্রকার এনজাইম নিঃসৃত হয়। মানুষ ও বানরের ট্রিপসিন অনুরূপ। এটি বানরের সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্কের পরিচায়ক। ভিন্ন ধরনের প্রাণীর ভিতর এইরূপ যোগসূত্র আভাস দেয় যে, সম্ভবত ইহারা একই পূর্ব পুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

**৫। শ্রেণিবিন্যাসগত প্রমাণ (Taxonomic evidence)-** সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের সকল জীবকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। যেমন- সকল এককোষী জীবকে প্রোটোজোয়া, দ্বিস্তরী প্রাণীকে নিডারিয়া পর্বে, নটোকর্ডধারী প্রাণীদের কর্ডাটা পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একটি পর্বের সকল প্রাণীর উৎপত্তিগত সাদৃশ্য থাকায় এদেরকে একই পর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু একটি পর্বের সকল প্রাণীর আকৃতি একই ধরনের হয় না। গঠনগত এরূপ পার্থক্যের কারণ এদের বিবর্তন। কর্ডাটা পর্বের সকল প্রাণীতে নটোকর্ড থাকলেও প্রাণীগুলো সকলেই একই ধরনের হয় না। নটোকর্ডের উপস্থিতি এদের উৎপত্তির দিক নির্দেশ করে, আবার এদের বিভিন্নতা বিবর্তনের দিক নিদের্শক।

**৬। জিনতত্ত্বীয় বা সুপ্রজননবিদ্যাঘটিত প্রমাণ (Genetical eveidence)-** জীবের দৈহিক গুণের আঁধার ক্রোমোসোমে অবস্থিত জিন। জিন পরিবেশের সাথে সম্পর্ক রেখে এর গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, যদি কোন উপায়ে জিনের গুণগত পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়, তবে ঐ জিন বহনকারী জীবটির দৈহিক লক্ষণেও পরিবর্তন

আসে। সুপ্রজননবিদগন রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগে অথবা অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে জিন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন। স্বল্প সময়ে কৃত্রিম উপায়ে জিনে যে পরিবর্তন আসে তা প্রাকৃতিক নিয়মে আসতে পারে। এতে হয়তো বেশি সময় লাগবে।

**৭। জীবাশ্মগত প্রমাণ** (Palaeontological Evidence)- **জীবাশ্ম বা ফসিল** (Fossil), ল্যাটিন Fossilis শব্দ থেকে ইংরেজি Fossil শব্দের উৎপত্তি। Fossilis শব্দের অর্থ হলো dug out বা খুড়ে তোলা। পূর্বে মাটি খুড়ে যা কিছু তোলা হতো তাকেই জীবাশ্ম বা ফসিল বলা হতো। বর্তমানে, পৃথিবীর ভূত্বকে (crust) প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত প্রাগৈতিহাসিক জীবের দেহ, দেহাবশেষ বা দেহের কোন অংশের চিহ্ন বা সাক্ষ্যকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলা হয়। Stickberger (১৯৯৮) এর মতে "Fossilis are geological remains, impressions or trace of organisms that existed in the past" প্রাগৈতিহাসিক জীবের সাক্ষ্য বা চিহ্ন হিসেবে মোল্ড (mold), কাস্ট (cast), হাত বা পায়ের ছাপ, গমন পথ (track), ট্রেইল (trail), গর্ত (boring), মলাশ্ম বা কপ্রোলাইট (coprolite) কে জীবাশ্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গমন পথ, ট্রেইল এবং জীবজনিত গর্তকে ট্রেস ফসিল (trace fossil) বা ইকনোফসিল (ichnofossil) বা জার্মান ভাষায় লেবেনস্পুরেন (lebenspuren) নামে আখ্যায়িত করা হয়। জীবাশ্মগত বিদ্যাকে জীবাশ্মবিদ্যা বা প্যালেন্টোলজি (palaeontology) বলা হয়।

বিবর্তনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণিক সাক্ষ্য (উপাদান) হচ্ছে জীবাশ্ম। জীবাশ্ম সম্পর্কিত জ্ঞান সংগ্রহ করতে হলে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাস্তর সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করতে হয় বলে বিবর্তনের এই প্রমাণকে ভূতত্ত্বীয় প্রমাণ (geological evidence) ও বলা হয়।

কালের পরিবর্তনে পৃথিবীর বুকে বহু জীব ধ্বংস হয়ে গেছে। শিলার বিভিন্ন স্তরে চাপা পড়ে অনেকেই জীবাশ্মে পরিণত হয়েছে। শিলার বিভিন্ন স্তর হতে পৃথিবীর বয়স নির্ণয় করা যায়। একটি বিশেষ স্তরে প্রাপ্ত জীবাশ্ম যার অর্থ হলো পৃথিবীর ঐ সময় কালে এটি জীবিত ছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তর থেকে ঘোড়া, হাতী, উট, মানুষ ইত্যাদির যে জীবাশ্ম সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে সাজালে ঐ সকল প্রাণীর ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা করা সম্ভব হয়। জীবাশ্মের এইরূপ রেকর্ড হতে দেখা যায় যে, ৬ কোটি বছর পূর্বে ইয়োসিন যুগে উত্তর আমেরিকায় এবং ইউরোপে প্রাপ্ত ১১ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট শৃগাল আকৃতির ইয়োহিপ্পাস (Eohippus) নামক প্রাণী হতে আধুনিক ঘোড়া ইকুয়াস (Equus) এর উদ্ভব হয়েছে। ইয়োহিপ্পাস এর অগ্রপদে চারটি এবং পশ্চাৎ পদে তিনটি করে আঙুল ছিল। ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ইয়োহিপ্পাস পায়ের আঙুলের সংখ্যা হ্রাস করে, দেহের আকৃতির বৃদ্ধি এবং দাতের সংখ্যা ও গঠনে পরিবর্তন এনে বর্তমান ইকুয়াস তথা আধুনিক ঘোড়াটির সৃষ্টি করে। যে সকল ধাপের মাধ্যমে ইয়োহিপ্পাস ইকুয়াসে বা আধুনিক ঘোড়ায় রূপান্তরিত হয় তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ইয়োহিপ্পাস.....আরোহিপ্পাস..... মেসোহিপ্পাস.....প্লিওহিপ্পাস.....ইকুয়াস (আধুনিক ঘোড়া)

**আর্কিওপটেরিক্স-আদি পাখির জীবাশ্ম (Archeopteryx-Ancient Bird Fossil)-** আদি পাখির নাম আর্কিওপটেরিক্স (*Archeaopteryx lithographica* যা অর্থ ancient wing inscribed in stone)। এদের কোন সদস্য বর্তমানে জীবিত নেই। আজ হতে ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ বছর পূর্বে জুরাসিক যুগে এর আবির্ভাব হয়েছিল। এই পাখির ধ্বংসাবশেষ জার্মানীর ব্যাভেরিয়ার বিখ্যাত সোলেনহোপেন অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করা হয়। মোট ১০টি জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয় যার মধ্যে সর্বশেষটি আবিষ্কৃত হয় ২০০৭ সালে। আর্কিওপটেরিক্স এর মধ্যে সরীসৃপ এবং পাখি উভয় জাতের বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান যার জন্য একে সংযোগকারী যোগসূত্র (connecting link) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

**আর্কিওপটেরিক্স এ সরীসৃপ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-** ১. লেজ অনেকগুলো কশেরুকা দ্বারা তৈরি। ২. অগ্রপদে নখরযুক্ত আঙুল, ৩. চোয়ালে সম-আকৃতির অনেকগুলো দাঁত বিদ্যমান।

**আর্কিওপটেরিক্স এ পাখির বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-** ১. সমস্ত দেহ পালক দ্বারা আবৃত, ২. চোয়াল পাখির চঞ্চুর ন্যায় লম্বা, ৩. ডানা আকৃতির অগ্র পা, ৪। সামগ্রিকভাবে এর দেহ পাখির ন্যায়।

আর্কিওপটেরিক্স আধা-পাখি ও আধা সরীসৃপ হওয়ায় প্রমাণ হয় যে, বিবর্তনের দ্বারা সরীসৃপকূল হতে আর্কিওপটেরিক্স এর মাধ্যমে আধুনিক পাখির উদ্ভব হয়েছে।

| শিক্ষার্থীর কাজ | ডারউইন-ওয়ালেস তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো নিচের ছকে লিখুন। | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**সারসংক্ষেপ**

বিবর্তনের অপর নাম অভিব্যক্তি। বিবর্তন বলতে সাধারণভাবে বুঝায় কোনো কিছু বিকশিত হওয়া, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হওয়া। বিবর্তনের মতবাদগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১. ল্যামার্কিজম, ২. ডারউইনিজম ও ৩. নব্য ডারউইনবাদ। বিবর্তন এর উল্লেখযোগ্য প্রমাণগুলো হলো- ১। অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ, ২। ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ, ৩। ভৌগোলিক প্রমাণ ৪। শারীরবৃত্তীয় প্রমাণ, ৫। শ্রেণিবিন্যাসগত প্রমাণ, ৬। জিন তত্ত্বীয় প্রমাণ ও ৭। জীবশ্মগত প্রমাণ।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৭

**বহু নির্বাচনি প্রশ্ন**

১। ইয়োহিপ্পাস হতে ইকুয়াসে রূপান্তরিত হওয়ার ধাপগুলোর ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?

ক. ইয়োহিপ্পাস- আরোহিপ্পাস-মেসোহিপ্পাস-ইকুয়াস

খ. ইয়োহিপ্পাস-আরোহিপ্পাস- মেসোহিপ্পাস-প্লিওহিপ্পাস-আধুনিক ঘোড়া

গ. ইয়োহিপ্পাস-আরোহিপ্পাস-প্লিওহিপ্পাস-ইকুয়াস

ঘ. ইয়োহিপ্পাস-আরোহিপ্পাস-প্লিওহিপ্পাস-মেসোহিপ্পাস-আধুনিক ঘোড়া

২। বিবর্তনের মতবাদ-

i. ল্যামার্কিজম

ii. ডারউইনিজম

iii. নব্য ডারউইনবাদ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। সাইক্লোন সিডরে সুন্দরবনের কাছাকাছি কয়েকটি জেলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তারমধ্যে কিছু গাছের তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতি হয়েছে। এসকল গাছের মধ্যে এখনো কিছু গাছ টিকে আছে। কারণ এরা পরিবেশের সাথে অভিযোজিত। একে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে। মতামতটি নিচের কোন বিজ্ঞানী দিয়েছেন?

ক. ল্যামার্ক খ. ডারউইন

গ. ওয়ালেস ঘ. মেন্ডেল

## চূড়ান্ত মূল্যায়ন

**সৃজনশীল প্রশ্ন-১ :**

একটি গবেষণায় কালাম বিশুদ্ধ কালো গিণিপিগের সাথে বিশুদ্ধ সাদা গিণিপিগের সাথে ক্রস করালেন। এতে প্রথম ও দ্বিতীয় বংশে স্বাভাবিক নিয়মে জিনোটাইপ ও ফিনোটাইপ পেলেন।

উদ্দিপকের আলোকে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন-

ক. মনোহাইব্রিড ক্রস কি?

খ. হেটারোজাইগাস বৈশিষ্ট্য বলতে কি বুঝেন?

গ. উদ্দিপকে উল্লিখিত গিণিপিগের মধ্যকার ক্রসটি জিনোটাইপের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. যদি গিণিপিগদ্বয়ের মধ্যকার ক্রসের দ্বিতীয় অধঃবংশে একই রকমের জিন অবস্থান কওে তবে এর ফলাফল বিশ্লেষণ করুন।

## উত্তরমালা

| | | | |
|---|---|---|---|
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১ : | ১. ক | ২.ক | ৩.খ |
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২ : | ১. খ | ২.ক | ৩.খ |
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩ : | ১. ঘ | ২.ঘ | ৩.ক |
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪ : | ১. খ | ২.ক | ৩.ক |
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৫ : | ১. ক | ২.ক | ৩.ক |
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৬ : | ১. গ | ২.ঘ | ৩.ক |
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৭ : | ১. খ | ২.ঘ | ৩.খ |